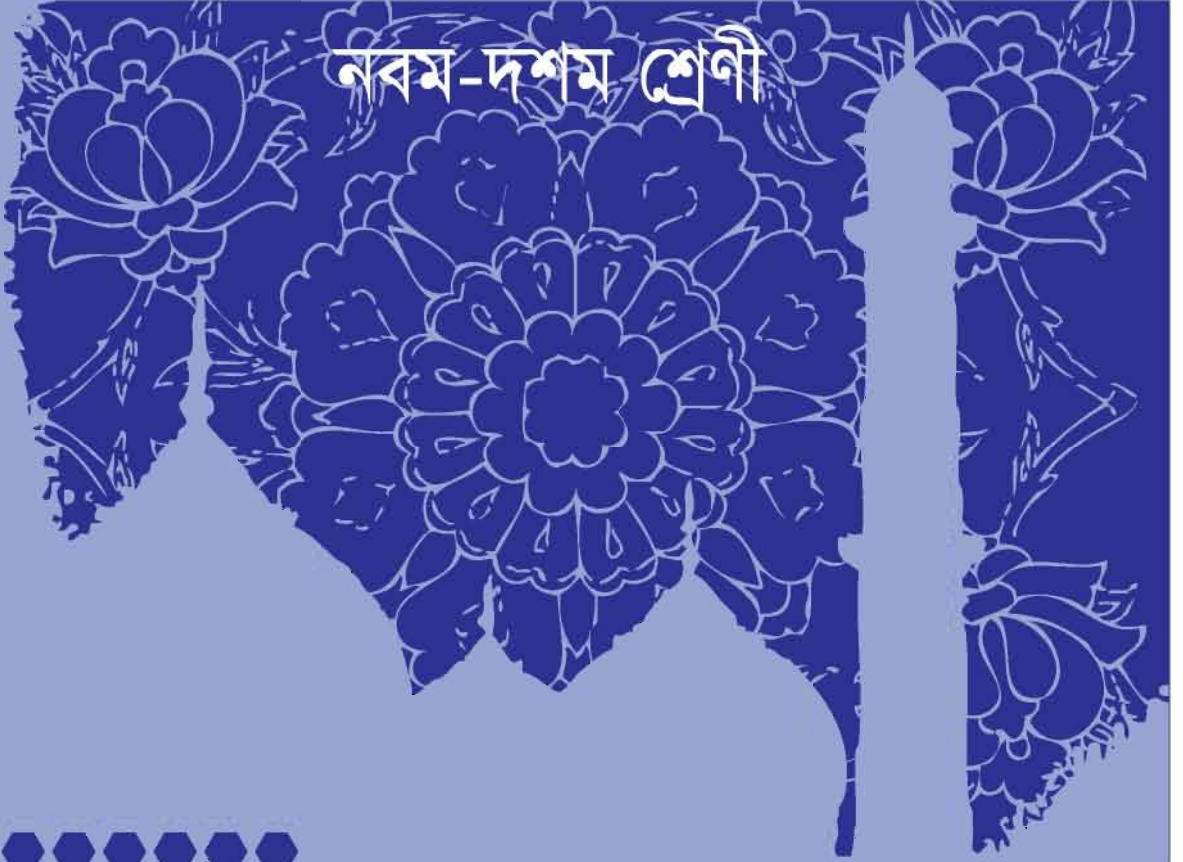


ইসলাম শিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত।

ইসলাম-শিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণী

সংকলন ও রচনা

ডঃ মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

এ বি এম আবদুল মান্নান মিয়া

হাফেয মুহাম্মদ লুৎফর রহমান

সম্পাদনা

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

মুহাম্মদ ইয়াসীন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিমিটেড
ফোন : ৯৫৬২৮৬৫, ৯৫৬৭৬০৮

প্রচ্ছদ
সেলিম আহমেদ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে : অঙ্কুর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওয়েব বিন্যাস)

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য ‘শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স’ গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষাবিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রাচ্য প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে-কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

শিক্ষাক্রমে নবম-দশম শ্রেণীর জন্য ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শ্রেণীভিত্তিক শিখনফল চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যেন সেগুলো পুরোপুরি অর্জন করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে শিখনফলভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শ্রেণীতে আকাইদ, শরীআতের উৎস, ইবাদাত, আখলাখ ও জীবনাদর্শ- এ পাঁচটি অধ্যায় স্বল্পপরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামের নিয়ম-কানুন জানা ও মানা এবং মূল্যবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার জন্য সহজ বাক্যরীতি, উপমা, শিক্ষামূলক কাহিনী, আদর্শ পুরুষের জীবনকথা ইত্যাদি অবতারণা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, কিছু আরবি শব্দের বানানের ক্ষেত্রে এনসিটিবির বানানরীতি অনুসরণ না-করে প্রচলিত বানান অনুসরণ করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যে-কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণীর ৬০টি পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করে সময়মতো পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মো: মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : আকাইদ	১-১৩	মালিক-শ্রমিকদের সম্পর্ক, নারীর মর্যাদা	৫৯
ইসলাম	১	চতুর্থ অধ্যায় : আখলাক	৬২-৮৬
তাওহীদ, কুফর	৩	তাকওয়া	৬২
কাফির, শিরক	৩	সত্যবাদিতা	৬৩
নিফাক	৫	আমানত	৬৪
রিসালাত	৬	আহদ বা ওয়াদা পালন	৬৫
আসমানী কিতাব	৮	আদল	৬৬
আখিরাত	৯	শালীনতা	৬৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : শরীআত-এর উৎস	১৪-৪৬	তাসাওউফ	৬৮
কুরআন মাজীদ	১৫	খিদমতে খাল্ক	৭০
সূরা আদুহা	২১	স্বদেশপ্রেম	৭২
সূরা আল-ইনশিরাহ	২৩	হালাল উপার্জন	৭৩
সূরা আততীন	২৫	বন্দু নির্বাচন	৭৪
সূরা আল-কাদর	২৭	পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ	৭৬
সূরা যিলযাল্	২৯	প্রতারণা	৭৭
আল্-হাদীস	৩১	গীবত, পরনিন্দা	৭৮
ইজমা	৩৯	হিংসা-বিদ্বেষ, ফিতনা-ফাসাদ	৭৯
কিয়াস	৪০	আদর্শ কাহিনী, ধূমপান ও মাদকাসক্তি	৮০
শরীআতের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষা	৪১	মাদকদ্রব্য	৮২
হালাল ও হারাম	৪৩	পঞ্চম অধ্যায় : জীবনাদর্শ	৮৭-৯৭
তৃতীয় অধ্যায় : ইবাদাত	৪৭-৬১	মহানবী (স)-এর জীবনাদর্শ	৮৭
হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ	৪৮	হযরত আবু বকর (রা)	৮৯
সালাত	৪৯	হযরত উমার ফারুক (রা)	৯০
যাকাত, সাওম	৫০	হযরত উসমান (রা)	৯১
হাজ্জ	৫১	হযরত আলী (রা)	৯২
জিহাদ	৫৩	মুসলিম মনীষী, শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান	৯৩
পিতামাতার অধিকার	৫৪	চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান	৯৪
আত্মীয়-স্বজনের অধিকার	৫৫	বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের অবদান	৯৫
প্রতিবেশীর অধিকার	৫৬	মানবকল্যাণে মুসলমানদের অবদান	৯৭
অসহায় দরিদ্রের অধিকার	৫৭	নির্ঘণ্ট :	১০০-১০৭
ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক, বড়-ছোট সম্পর্ক	৫৮	১-আল্ কুরআন	
		২-আল্ হাদীস	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইসলামের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। সৃষ্টির সূচনা থেকে মানবজীবনের সকল দিক এমনকি মৃত্যু পরবর্তী জীবন এর আওতাভুক্ত। ইসলাম-শিক্ষার আকাইদ, শরীআতের উৎস, ইবাদাত, আখলাক ও জীবনাদর্শ শিরোনামে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় স্বল্প পরিসরে এ পুস্তকে বর্ণনা করা হল।

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ (الْعَقَائِدُ)

আরবি ভাষায় ‘আকীদা’ শব্দের বহু বচন আকাইদ। আকীদা অর্থ বিশ্বাস, আর আকাইদ অর্থ বিশ্বাসমালা। আকাইদ হল ইসলামের মূল ভিত্তি। কুরআন মাজীদে স্পষ্ট আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা আকাইদের বিষয়গুলো প্রমাণিত। তাই আকাইদের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলাম (الْإِسْلَامُ)

ইসলামের পরিচয়

ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা। আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর পূর্ণ আনুগত্য ও তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা, বিনা দ্বিধায় আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেওয়া বিধান অনুসারে জীবনযাপন করাকে ইসলাম বলে। যিনি ইসলামের বিধান অনুসারে চলেন, তিনি হলেন মুসলিম।

ইসলামের ভূমিকা

ইসলাম আল্লাহ তাআলার মনোনীত ‘দ্বীন’ অর্থাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকেই এক জন মুসলিমকে জীবনযাপন করতে হয়। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা। রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, ন্যায়-নীতি ও সুবিচারভিত্তিক শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ গতিশীল সমাজ গঠন ও সংরক্ষণে ইসলামের কোন বিকল্প নেই।

ইসলাম-শিক্ষার গুরুত্ব

মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে হলে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সাম্য, উদারতা, মানবতাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে চলতে হয়। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী চলতে হলে ইসলাম বিষয়ক জ্ঞানার্জন এবং ইসলাম-শিক্ষা বিষয় পাঠ করা প্রত্যেক নরনারীর জন্য একান্ত আবশ্যিক।

ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং সে অনুসারে আমল করাকে ঈমান বলে। ঈমানের সাথে ইসলামের ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। ইসলাম ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ। শিকড়ের সাথে গাছের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লবের যে সম্পর্ক, ঈমানের সাথে ইসলামেরও সেই সম্পর্ক। গাছের শিকড় মাটির ভেতর থেকে যে খাদ্যরস যোগায়, তাতেই গাছের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব সজীব ও সতেজ হয়। ঈমান মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি অনুরাগ এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের বাসনা সৃষ্টি করে। তাতেই ইসলাম সজীব ও সতেজ হয়ে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়।

ঈমানের সাতটি মূল বিষয়

একজন মুসলিমকে ঈমানের কতকগুলো মূল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হয়। এগুলো হল :

১. এক আল্লাহতে বিশ্বাস

একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ইবাদাতের মালিক হিসেবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা।

২. মালাইকা বা ফেরেশতাকুলে বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ নূরের তৈরী, আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তাঁদের পানাহারের প্রয়োজন হয় না। তাঁরা সবসময় আল্লাহর আদেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকেন। তাঁরা কখনও আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন না। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যিক।

৩. আল্লাহর কিতাবসমূহে বিশ্বাস

পথভ্রষ্ট মানুষদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আল্লাহপাক যুগে যুগে রাসূলগণের কাছে বাণী পাঠাতেন। এ বাণীসমূহের সংকলনকে আল্লাহর কিতাব বা আসমানী কিতাব বলে। এ কিতাবসমূহে বিশ্বাস করা আবশ্যিক।

৪. নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস

নবী-রাসূলগণ মানুষের শিক্ষক। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ডাকতেন এবং সৎপথ দেখাতেন। যে সকল নবীগণের নিকট কিতাব বা সহীফা নাযিল হয়েছে তাঁদেরকে রাসূল বলে। কিতাবে বিশ্বাসের মতই নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও একান্ত প্রয়োজন।

৫. আখিরাতে বিশ্বাস

মৃত্যুর পরের জীবনকে আখিরাত বলে। দুনিয়ার ভালমন্দ কাজের হিসেব দিতে হবে আখিরাতে। আখিরাতেই দুনিয়ার ভালমন্দ কাজের পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হবে। এতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

৬. তাকদীরে বিশ্বাস

তাকদীর বা ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণকারী মহান আল্লাহ। তিনিই এর ভালমন্দ নির্ধারণকারী। মানুষ চেষ্টা সাধনা করবে, কাজ করবে এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে। সফল হলে শোক্র করবে। বিফল হলে সর্ব্ব করবে।

৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস

ইহকালে কে, কী কাজ করেছে পরকালে তার জবাবদিহিতার জন্য হাশরের ময়দানে সবাইকে উঠানো হবে। সেখানে সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে বিচার করা হবে। একে বলে পুনরুত্থান। আমাদের এসব বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে।

এ পাঠে আমরা জানলাম-

- ১। ইসলামের পরিচয়, মানবজীবনে ইসলামের ভূমিকা এবং ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব ও বুঝলাম। সুতরাং আমরা গুরুত্বের সাথে ইসলাম-শিক্ষা বিষয় পাঠ করব।
- ২। ঈমান ও ইসলামের মধ্যে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ঈমান ছাড়া ইসলাম কল্পনা করা যায় না। আবার ইসলাম ছাড়া ঈমানের সুফল পাওয়া যায় না।
- ৩। ঈমানের সাতটি মূল বিষয়। আমরা এ বিষয়গুলোর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করব। আমাদের জীবনে এ বিশ্বাসের সার্থক প্রতিফলন ঘটবে। ঈমান ও সৎকর্মের সমন্বয়ে আমাদের জীবন সুন্দরভাবে গড়ে তুলবো।

তাওহীদ (التَّوْحِيدُ)

পরিচয়

মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। এ বিশ্বাসের নাম তাওহীদ। তাওহীদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। ইসলামী পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ইবাদাত ও আনুগত্যের যোগ্য একক সত্তা হিসেবে স্বীকার ও বিশ্বাস করাকেই তাওহীদ বলে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেন-

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (৫)

অর্থ : “আসমান ও জমিনে যদি আল্লাহ ব্যতীত একাধিক ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।”

(সূরা আল-আম্বিয়া : ২২)

তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও প্রভাব

ইসলামের যেসব মূল বিষয়ের ওপর বিশ্বাস করতে হয়, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। এটি ঈমানের প্রথম কথা। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মূল হল তাওহীদ। ইসলামের সকল শিক্ষাই তাওহীদে বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল মানুষের হিদায়াতের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এ সংগ্রামে হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিকুণ্ডে নিষ্কিন্ত হয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছেন, হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন।

এক আল্লাহর প্রভুত্ব স্বীকার করে নিলে অসংখ্য সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাওহীদে বিশ্বাসী মানুষ অন্য মানুষ, জড় পদার্থ, প্রকৃতি বা অন্য কোন শক্তির সামনে মাথা নত করে না। তাওহীদে বিশ্বাস মানুষের আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলে। এ বিশ্বাস সব বিভেদ ভুলিয়ে সকল সৃষ্টির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে। তাওহীদে বিশ্বাসের ফলে উদার দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়। তাওহীদে বিশ্বাসীকে কোন কিছুই তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। তিনি সৎকর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত হন।

আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহ পাক তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে একক ও অদ্বিতীয়। সত্তায়, গুণে, কর্মে, শক্তিতে তথা সর্ববিষয়ে তিনি অতুলনীয়। তাঁর সত্তা ও গুণের সাথে তুলনা করা যায় এমন কোন কিছুই নেই। কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছে, “তাঁর মত কোন কিছুই নেই। তিনি অনাদি, অনন্ত, চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।”

তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন এবং তাঁর সৃষ্টিকে যেমনভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করেন। তাঁরই নির্দেশে এক অপূর্ব সুন্দর নিয়মে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষপথে পরিচালিত হচ্ছে। কোনরকম বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি এক না হলে বিশ্বজগতের পরিচালনায় নানারকম বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষ দেখা দিত এবং সারা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেত।

কুফর (الْكُفْرُ)

পরিচয়

ইসলামের মূল বিষয়গুলো বিশ্বাস করা হল ঈমান। আর সেগুলোকে অবিশ্বাস করা হল কুফর। কুফর শব্দের অর্থ ঢেকে রাখা, গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করা ও অস্বীকার করাকে কুফর বলে। অনুরূপভাবে ইসলামের যেসব মূল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা একান্ত জরুরি সেগুলোকে অবিশ্বাস করাও কুফর। ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ্যে কুফরের চিহ্ন ধারণ করা, ক্রুশ পরিধান করা, পৈতা পরা ইত্যাদিও কুফর।

কাফির

যে ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত হয় তাকে কাফির বলে। বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ ঘোষণা করছে। কাফির ব্যক্তি এ মহাসত্যকে দেখেও গোপন করে, অস্বীকার করে, অবিশ্বাস করে। মানুষ সবসময় আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিআমতের মধ্যে ডুবে আছে। আগুন, পানি, আলো, বাতাস, সবকিছুই আল্লাহর দান। মানুষের হাত, পা, চোখ, কান, মস্তিষ্ক, জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য সবই আল্লাহর দান। এরপরও যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে সে চরম অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য ও কাফির।

কুফরের পরিণতি

১. কাফির অকৃতজ্ঞ : আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিআমত ভোগ করেও যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, তার মত অকৃতজ্ঞ আর কে হতে পারে? অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির দুনিয়ায় কোন মর্যাদা নেই। আর তার জন্য রয়েছে আখিরাতে কঠিন শাস্তি।

২. অবাধ্য ও বিরোধী : কাফির ব্যক্তি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর অবাধ্য এবং তাঁর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধানের বিরোধী। সে আল্লাহদ্রোহী। আল্লাহদ্রোহীর শাস্তি অতি কঠোর।

৩. কুফর একটি জঘন্য যুল্ম : হাশরের ময়দানে কাফিরের বিরুদ্ধে তার নিজের অজ্ঞ-প্রত্যজ্ঞ আল্লাহর আদালতে অভিযোগ করবে। বলবে, সে আমাদের কুপথে চালিত করেছে। আল্লাহ এ বিদ্রোহী যালিমের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

৪. হতাশা : কুফর ও নাফরমানী করলে মানুষ ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহর প্রতি তার ভরসা নেই। ব্যর্থ ও হতাশ ব্যক্তির পরিণতি অতি শোচনীয়। কেননা সে পার্থিব ব্যর্থতাকে মেনে নিতে পারে না।

৫. অনন্তকালের শাস্তি : এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, “যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমার নির্দেশগুলো মিথ্যা জানবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।” (সূরা আল-বাকার : ৩৯)

প্রতিকার

লজ্জা ও অনুশোচনার সাথে তওবা করে কাফির ব্যক্তি যদি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে তাহলে সে ক্ষমা পাওয়ার আশা করতে পারে।

শির্ক (الشِّرْكُ)

পরিচয়

শির্ক অর্থ অংশীবাদ অর্থাৎ একাধিক স্রষ্টা, একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস করা। মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা বা কাউকে তাঁর সমগুণসম্পন্ন ও সমতুল্য মনে করাকে শির্ক বলে। যে ব্যক্তি শির্ক করে, তাকে বলে মুশরিক। আল্লাহর ইবাদাতে অন্য কোন শক্তি বা বস্তু शामिल করাও শির্ক।

কুফল

শির্কের অপরাধ যে কত জঘন্য সে সম্বন্ধে আল্লাহ পাক বলেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء : ৪৮)

অর্থ - “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না, তাছাড়া অন্য যে কোন গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।” (সূরা আন-নিসা : ৪৮)

শির্ক যে অমার্জনীয় অপরাধ শুধু তাই নয় বরং এতে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষের অমর্যাদাও করা হয়। মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। মানুষকে এমন সব গুণ দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা সে অন্য সব সৃষ্টিকে বশে এনে নিজের কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম। কিন্তু মুশরিক ঐসবের সামনে মাথা নত করে। এভাবে নিজের মর্যাদাহানির জন্য সে নিজেই দায়ী। শির্কের মাধ্যমে মানব সমাজে বিবাদ ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। বড় ছোট এর পার্থক্য সৃষ্টি হয়। মুশরিক নানারকম জড় পদার্থ, দেবদেবী, প্রতিমা, প্রাকৃতিক শক্তির সামনেও মাথা নত করে। এ হচ্ছে মানবতার চরম অবমাননা।

প্রতিকার

শির্ক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তবে আন্তরিকভাবে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে ও ঈমানের বিপরীত আর কিছু না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এবং ঈমানের দাবী অনুসারে কাজ করলে আল্লাহ পাক দয়া করে এ অপরাধও ক্ষমা করে দিতে পারেন।

নিফাক (النِّفَاقُ)

পরিচয়

নিফাক শব্দের অর্থ কপটতা, ভণ্ডামী, ঝোঁকাবাজি ও দ্বিমুখীভাব পোষণ করা। অন্তরে বিরোধিতা গোপন করে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করা। ইসলামী পরিভাষায় অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন রেখে মুখে ঈমানদারসুলভ বাক্য উচ্চারণ এবং লোক দেখানো অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাকে নিফাক বলে। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, তাকে বলে মুনাফিক। মহানবী (স) মুনাফিকদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন-

“মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি ১. যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে। ২. যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। ৩. যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয়, তা খিয়ানত করে।” – (বুখারী ও মুসলিম)

কুফল

১. নিফাক জঘন্যতম পাপ। মুনাফিকদের অন্তরে অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা লুক্কায়িত থাকে, তাই তারাও কাফির।
২. কুরআন মাজীদে মুনাফিকদের মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাদের অপকীর্তির উল্লেখ করে একটি পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।
৩. তারা কাফির অপেক্ষাও মারাত্মক ক্ষতিকর, ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য মুনাফিকরা কাফির অপেক্ষা জঘন্য শত্রু।
৪. পরকালে তাদের ভীষণ শাস্তি বর্ণনা করে আল্লাহ পাক বলেন-

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ – (النساء : ১৪০)

অর্থ : “নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে।” (সূরা আননিসা : ১৪৫)

৫. মুনাফিকরা দ্বিমুখী নীতিবিশিষ্ট। দ্বিমুখী নীতিবিশিষ্ট মানুষের কোন মানমর্যাদা থাকে না। কেউ তাদের বিশ্বাস করে না। মিথ্যাবাদী প্রতারক মুনাফিকদের কবুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়।

এ পাঠে জানলাম -

- ১। তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত্ব এবং আল্লাহর পরিচয়।
- ২। কুফর, শির্ক ও নিফাক সম্বন্ধে ধারণা লাভ করলাম এবং ঐসবের কুফল সম্পর্কে বুঝলাম। আমরা কুফর শির্ক ও নিফাক থেকে দূরে থাকব। তাওহীদে বিশ্বাসী খাঁটি মুমিন হিসেবে সুন্দর জীবনযাপনে ব্রতী হব।

রিসালাত (الرِّسَالَةُ)

পরিচয়

রিসালাত শব্দের অর্থ বার্তা, চিঠি পৌছানো, সংবাদ বা কোন শুভ কর্মের দায়িত্ব বহন করা। রাসূলের দায়িত্ব বা পদকে রিসালাত বলে। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ পাকের পবিত্রবাণী মানুষের কাছে পৌছে দেওয়াকে রিসালাত বলে।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

তাওহীদে বিশ্বাস করা যেমন জরুরি, রিসালাতে বিশ্বাস করাও তেমনি জরুরি। আমরা আল্লাহর পরিচয় জানতাম না। আল্লাহ তাআলা মেহেরবাণী করে আমাদের কাছে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা আমাদের আল্লাহর পরিচয় জানিয়েছেন। রিসালাতে বিশ্বাস না করলে আল্লাহর বাণীকে অবিশ্বাস করা হয়। আল্লাহর বাণী অবিশ্বাস করলে আল্লাহকেই অবিশ্বাস করা হয়। সুতরাং রিসালাতে বিশ্বাস করা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

কালিমা তায়্যিবাতে **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** দ্বারা তাওহীদের ঘোষণা করা হয়েছে এবং **مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ**

দ্বারা রিসালাতের ঘোষণা করা হয়েছে।

নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

আমাদের সব কাজকর্মেরই উদ্দেশ্য থাকে। আল্লাহ পাকও উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কাজ করেন না। তিনি পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তার পেছনেও মহৎ উদ্দেশ্য আছে। আর তা হচ্ছে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত যত নবী-রাসূল এসেছেন তাঁদের সবার উদ্দেশ্যই এক – মানুষের হিদায়াত, তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা।

নবী-রাসূলগণের গুণাবলী

নবী-রাসূলগণ ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সৎ, সত্যবাদী ও সত্যপ্রিয়। নিজে সৎ না হয়ে অন্যকে সৎপথে পরিচালিত করা যায় না। মিথ্যাবাদী ও অসৎ লোকের পক্ষে রিসালাতের মহান দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। নবী-রাসূলগণ ছিলেন নিঃস্বার্থ, নির্লোভ ও নিষ্পাপ। আল্লাহর দীন প্রচার করতে গিয়ে তাঁরা অকাতরে নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কোন স্বার্থপর, লোভী ও পাপীর পক্ষে এত বড় ত্যাগস্বীকার করা সম্ভব নয়। আমাদের প্রিয় নবী (স) ছিলেন ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। কাফিররা তাঁকে অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, “আমার এক হাতে চাঁদ আর এক হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি সত্য প্রচারে পিছপা হব না।”

নবুওয়্যাতের ধারা

সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ)-এর মাধ্যমে নবী-রাসূল আগমনের সূচনা হয়েছে এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে তা সমাপ্ত হয়েছে। এ দুই জনের মাঝে অসংখ্য নবী-রাসূল এসেছেন। নবুওয়্যাত বা রিসালাতের ধারা বলতে আমরা নবী-রাসূল আগমনের এ ক্রমধারাকেই বুঝি।

নবী-রাসূল আগমনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সুপথে পরিচালিত করা। তেমনি তাঁদের শিক্ষা প্রচারের ভিত্তিও ছিল তাওহীদ। দ্বীনের মূল কাঠামো এক ও অভিন্ন। আদম (আ) যে দীন প্রচার করেছেন, নূহ (আ), ইবরাহীম (আ), মুসা (আ), ঈসা (আ) এবং মুহাম্মাদ (স)ও সেই একই দীন প্রচার করেছেন। মানুষ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তরে ছিল তখন তাদের জন্য সহজ বিধান দেওয়া হয়েছিল। ধাপে ধাপে উন্নতির সাথে সাথে তাদের বিধানেরও প্রসার ঘটতে থাকে। আদম (আ)-এর মাধ্যমে যে দ্বীনের সূচনা হয়েছিল, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে তার সমাপ্তি ও পূর্ণতা ঘটেছে।

আমরা সকল নবী-রাসূলে সমানভাবে বিশ্বাস করি। কাউকে বিশ্বাস করব, আর কাউকে বিশ্বাস করব না, তা হতে পারে না। কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছে- (البقرة : ২৮০) لَا نَفَرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

অর্থ : “আমরা আল্লাহর রাসূলগণের মধ্যে তারতম্য করি না।” (সূরা আল-বাকারা : ২৮৫)

সকল নবী-রাসূলগণকে বিশ্বাস করা ইসলামের মূলনীতি।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বৈশিষ্ট্য

হযরত মুহাম্মাদ (স) হলেন বিশুবনবী, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। অন্যান্য নবীগণ কোন বিশেষ গোত্র, বিশেষ দেশ এবং বিশেষ সময়ের জন্য দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। মুহাম্মাদ (স) ছিলেন সারা বিশ্বের নবী। আল্লাহ পাক বলেন, “আমি আপনাকে সারা বিশ্বের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।” (সূরা আল-আম্বিয়া : ১০৭) তিনি আরও বলেন, “বলুন, হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার কাছেই আল্লাহর রাসূল হিসেবে এসেছি।” (সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৮)

অন্যান্য রাসূলগণের প্রতি যেসব কিতাব বা সহীফা নাখিল হয়েছিল, তার কোন কোনটি ছিল বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য। মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন মাজীদ নাখিল হয়েছে। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত অনাগত সকল মানুষের সকল সমস্যার সঠিক সামাধান বিদ্যমান। তাঁর পরে কোন নবী আসেন নি। আসবেন না, আর আসার প্রয়োজনও নেই। আল্লাহ পাক তাঁকে “খাতমুন নাবিয়ীন” সর্বশেষ নবী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

খাতমে নবুওয়্যাতের অর্থ এবং এতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

খাতমুন শব্দের অর্থ সমাপ্তি বা শেষ। খাতমুন নবুওয়্যাত অর্থ নবুওয়্যাতের সমাপ্তি। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে যত নবী-রাসূল এসেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ (স) সর্বশেষ। আল্লাহ পাক বলেন, “মুহাম্মাদ (স) তোমাদের কোন পুরুষ লোকের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী” (সূরা আল-আহযাব : ৪০)।

খাতমুন শব্দের আর এক অর্থ সীলমোহর, উপসংহার, সমাপ্তি। কোন কিছুতে সীলমোহর তখনই অঙ্কিত করা হয়, যখন তা পূর্ণ বা সমাপ্ত হয়ে যায়। তাতে আর কিছু প্রবেশ করানো বা তা থেকে বের করার অবকাশ থাকে না। মহানবী (স)-কে আল্লাহপাক সর্বোত্তম আদর্শ, মহান চরিত্র এবং সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন মাজীদ দান করেছেন। এতে সব আসমানী কিতাবের শিক্ষার সার কথা রয়েছে। সকল যুগের সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। আল-কুরআনের পরে আর কোন আদর্শ ও জীবনবিধানের প্রয়োজন নেই।

মহানবী (স) বলেছেন- **أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَأَنْبِيَ بَعْدِي** -

অর্থ : “আমি শেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই।”

হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বশেষ নবী বলে বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ। নতুবা আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহ পাককেই অবিশ্বাস করা হয়। খাতমে নবুওয়্যাতের এত সব সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (স)-এর পরে কেউ নবী হওয়ার দাবি করলে সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড।

এ পাঠে আমরা জানলাম-

রিসালাতের পরিচয় ও গুরুত্ব, নবী-রাসূলগণের গুণাবলী, নবুওয়্যাতের ধারা, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বৈশিষ্ট্য এবং খাতমে নবুওয়্যাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব।

আমরা এ বিষয়গুলোর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করব। নবী-রাসূলদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করব। মহানবী (স)-এর আদর্শে আমাদের জীবন গড়ে তোলব।

আসমানী কিতাব

পরিচয়

কিতাব শব্দের সহজ অর্থ পুস্তক বা গ্রন্থ। যে মহান গ্রন্থে আল্লাহর বাণী লিপিবদ্ধ আছে তাকে আসমানী কিতাব বলে। আল্লাহর বাণী সম্বলিত বড় গ্রন্থকে কিতাব আর ছোট পুস্তিকাকে সহীফা বলে।

নবী-রাসূলগণ যাতে সঠিকভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সেজন্য তাঁদের কাছে ওহী বা আল্লাহর বাণী আসত। এ বাণীসমূহের সমষ্টি আসমানী কিতাব নামে অভিহিত।

কিতাবে বিশ্বাসের গুরুত্ব

এক জন মুসলিমের তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস করা যেমন জরুরি, আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাস করাও তেমনি জরুরি। কারণ কিতাবের মাধ্যমেই আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত প্রভৃতি মূল বিষয়গুলো জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে কিতাবে বিশ্বাস না করলে তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস করা হয় না, আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাস করা হয় না। মোট একশত চারখানা আসমানী গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে চারখানা প্রধান ও প্রসিদ্ধ কিতাব এবং একশত খানা সহীফা।

প্রসিদ্ধ কোন কিতাব কোন রাসূলের ওপর নাযিল হয়েছিল তা নিচে উল্লেখ করা হল :

১. তাওরাত হযরত মুসা (আ)-এর ওপর, ২. যাবুর হযরত দাউদ (আ)-এর ওপর, ৩. ইনজীল হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর, ৪. কুরআন মাজীদ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর নাযিল হয়েছিল।

আর একশত খানা সহীফার মধ্যে দশখানা আদম (আ)-এর ওপর, দশখানা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওপর, ত্রিশখানা হযরত ইদরীস (আ)-এর ওপর এবং পঞ্চাশখানা হযরত শীস (আ)-এর ওপর নাযিল হয়।

কুরআন মাজীদের পরিচয়

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা আল্লাহর নিকট থেকে জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়। মহানবী (স)-এর নবুওয়্যাতের জীবনে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে কুরআন নাযিল হয়েছিল। একমাত্র কুরআন মাজীদই সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে এবং থাকবে। কারণ কুরআন মাজীদ অত্যন্ত গুরুত্ব ও যত্নসহকারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ও সংকলিত হয়েছে। আর এটি সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ আসমানী কিতাব বলে আল্লাহ পাক নিজেই এর হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তা হিফাযতকারী”। (সূরা আল-হিজর : ৯)

শ্রেষ্ঠত্ব, বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

কুরআন মাজীদ বিশ্বমানবের ইহকাল ও পরকালের সামগ্রিক কল্যাণের পথপ্রদর্শক একটি সর্বজনীন, শাস্ত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। গোটা বিশ্বের মানুষের পথের দিশারী সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ। এতে অতীতের পয়গম্বরগণের কার্যকলাপ ও কৃতিত্বের নিখুঁত বিবরণ এবং অতীত জাতিসমূহের বহুবিধ তথ্য বিদ্যমান। অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনা এ মহাগ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

ঐতিহাসিক ও গবেষকদের জন্য এ গ্রন্থ বহু তথ্যের উৎস। কুরআনের মাধ্যমেই বিশ্বজগৎ ও সৃষ্টি বৈচিত্র্যের বৈজ্ঞানিক সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

জাহিলি যুগে আরবে অশ্লীল কাব্যচর্চার যে জোর প্রতিযোগিতা চলছিল, পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তা বন্ধ হয়ে যায়। কুরআনের ভাব ও ভাষার মাধ্যমে কবিগোষ্ঠীর চমক লেগে যায়। তারা এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপারগ হয়ে এটি মানুষের রচিত গ্রন্থ নয় বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অনেক অমুসলিম মনীষীও কুরআন মাজীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অসংখ্য জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি কুরআনের ভাষা অলংকার, উপমা, ছন্দ ও রচনালৈলীতে গভীরভাবে মুগ্ধ হন। কুরআন মাজীদের ভাষা চমৎকার, অতুলনীয় ও জীবন্ত।

সর্বশেষ আসমানী কিতাব

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব। আল্লাহপাক কুরআন মাজীদেদে দ্বারা দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কুরআন মাজীদই মানবজাতির সর্বশেষ দিশারী।

কুরআন মাজীদ অবিকৃত

কুরআন মাজীদ যে ভাষায় নাযিল হয়েছিল, ঠিক সেই ভাষায়ই অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। কুরআন মাজীদ সম্পূর্ণ আল্লাহর বাণী, এতে অন্য কিছু মিশ্রিত হয়নি।

এ পাঠে আমরা জানলাম—

আসমানী কিতাবের পরিচয় ও গুরুত্ব, কুরআন মাজীদেদে পরিচয়, আসমানী কিতাব বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা এবং কুরআন মাজীদেদে শ্রেষ্ঠত্ব, বৈশিষ্ট্য ও মহাত্ম্য।

আমরা যত্নের সাথে শুম্বভাবে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করব এবং এর শিক্ষা মেনে চলব।

আখিরাত (الْآخِرَةُ)

পরিচয়

আখিরাত অর্থ পরকাল। ইহকালের পরের জীবনকে বলে পরকাল। মৃত্যুর পর থেকেই আখিরাতের জীবন শুরু হয়। সে জীবনের শুরু আছে, শেষ নেই। সে জীবন অনন্তকালের। মানুষ ইহজীবনে যে যেমন কাজ করবে, পরকালে সে তেমন ফল ভোগ করবে।

মহানবী (স) বলেছেন - **الْأَنْبِيَاءُ مَرْعَةُ الْآخِرَةِ** অর্থ : “দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।”

অর্থাৎ ইহকালে ভাল কাজ করলে পরকালে পুরস্কার পাবে, আর মন্দ কাজ করলে শাস্তি পাবে।

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস করা যেমন ঈমানের অঙ্গ, আখিরাতে বিশ্বাস করাও তেমন ঈমানের অঙ্গ। মুমিন ও

মুত্তাকীদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ বলেন - **وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ** -

অর্থ : “তারা আখিরাতেও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।” (সূরা আল-বাকার : ৪)

মহানবী (স) তাঁর মক্কার জীবনে তাওহীদ ও আখিরাতের কথাই বেশি প্রচার করেছেন। যারা আখিরাত অবিশ্বাস করেছে, সকল নবী-রাসূলই তাদেরকে কাফির হিসেবে গণ্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া তাওহীদ, রিসালাত ও কিতাবে বিশ্বাস করা হয় না। সুতরাং মুমিন হওয়ার জন্য আখিরাতে বিশ্বাস অপরিহার্য। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বশীল ও সৎকর্মশীল করে তোলে। ইহজীবনের আমল সম্বন্ধে সতর্ক করে তোলে। কারণ সে বিশ্বাস করে যে, ইহকালের মন্দ কাজের জন্য পরকালে আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। পরকালের শাস্তির ভয়ে মন্দকাজ থেকে সে বিরত থাকে, আর পুরস্কারের আশায় ভাল কাজে আগ্রহী হয়। এভাবে আখিরাতে বিশ্বাস মানব চরিত্রকে উন্নত করে।

পক্ষান্তরে যে লোক আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তার কাছে দুনিয়ার জীবনের গুরুত্বই বেশি। সে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার ভয় করে না। সুতরাং যা খুশি তাই করে। যার মনে আল্লাহর ভয় নেই, সে সুযোগ পেলেই যে কোন পাপ কর্মে লিপ্ত হতে পারে। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাসের প্রভাব মানবজীবনে অপরিণীম। এ বিশ্বাস মানবজীবনকে দায়িত্বশীল, কলুষমুক্ত ও সুন্দর করে তোলে।

আখিরাতের জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১. মৃত্যু

মৃত্যু থেকেই আখিরাতের জীবন শুরু হয়। যার জন্ম আছে, তার মৃত্যু আছে। আল্লাহ বলেন-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط অর্থ : “প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।” (সূরা আলে-ইমরান : ১৮৫)

নেক বান্দাদের মৃত্যুতে কষ্ট কম আর পাপীদের কষ্ট বেশি হবে।

২. কবর

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কে কবর বা বারযখের জীবন বলে। কবরে মুনকার ও নাকীর নামে দুই জন ফেরেশতা তিনটি প্রশ্ন করবেন। যাদের কবর দেওয়া হয় না তারাও এ প্রশ্ন থেকে রেহাই পাবে না। প্রশ্ন করা হবে- রব, দ্বীন ও রাসূল সম্বন্ধে। পৃথিবীতে যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথামত চলে, তারা জবাব দিতে পারবে। তাদের কবর হবে জান্নাতের মত সুখের স্থান। যারা আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর কথামত চলে না, তারা উত্তর দিতে পারবে না। তাদের কবর হবে অত্যন্ত কষ্টের জায়গা।

৩. কিয়ামত

এমন এক দিন ছিল যখন বিশৃঙ্খল কিছুই ছিল না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজের কুদরতে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আবার এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ আল্লাহকে ভুলে যাবে। আল্লাহর নাম নেওয়ার মত কেউ থাকবে না। তখন আল্লাহ বিশৃঙ্খল ধ্বংস করে দেবেন। বিশৃঙ্খল জগতের এই মহাপ্রলয় বা ধ্বংসকে কিয়ামত বলে। নির্ধারিত সময় ইসরাফীল (আ) শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। এর ফলে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। বিশৃঙ্খল জগতের এমন পরিণতি বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, এক সময় সূর্য শীতল হয়ে যাবে। চন্দ্র, সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে। গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্রের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটবে এবং পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

পরবর্তী ফুঁকে মানুষ কবর থেকে এবং যে যেখানে থাকবে সেখান থেকে উঠে দাঁড়াবে। এ দাঁড়ানোকে কিয়ামত বলা হয়। একে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানও বলা হয়ে থাকে।

৪. হাশর

পুনরুত্থানের পর এক জন আহ্বানকারী ফেরেশতার ডাকে মানুষ এক বিশাল ময়দানে সমবেত হবে। একে বলা হয় হাশর বা মহাসমাবেশ। হাশর ময়দানে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার কাজের জবাবদিহি করতে হবে। পৃথিবীতে যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তারা আল্লাহর রহমত পাবে, আরামে থাকবে। যারা ঈমান আনেনি, ভাল কাজ করেনি, তাদের ভীষণ আযাব হবে।

পুণ্যবান ব্যক্তিগণ সেদিন আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবেন। তাঁদের কষ্ট হবে না। তাঁরা প্রশান্ত চিত্তে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করবেন।

হাশরের দিন মানুষ ও জ্বীন দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব ও খতিয়ান সম্বলিত আমলনামা দেখতে পাবে। শুরু হবে অতি সূক্ষ্মবিচার। আল্লাহ পাক হবেন বিচারক। নবী-রাসূল ও ফেরেশতাগণ হবেন সাক্ষী।

৫. মীযান

হাশরের দিন আমাদের পাপপুণ্য ওয়ন করা হবে। আর যা দ্বারা ওয়ন করা হবে তাকে বলে মীযান। যাঁদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে তাঁরা হবেন জান্নাতের অধিকারী। আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে তারা হবে জাহান্নামী।

৬. জান্নাত

জান্নাত শব্দের অর্থ উদ্যান বা বাগান। ইহকালে সংক্ষিপ্ত জীবনের পর মুমিনের জন্য যে অনন্ত সুখময় চিরস্থায়ী

আরামদায়ক স্থান তৈরী করে রাখা হয়েছে তাকে বলে জান্নাত। জান্নাতে আছে আরামের সবরকম ব্যবস্থা। মন যা চাবে সেখানে তা পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন : “জান্নাতে তোমাদের মন যা চাবে, তা তোমাদের দেয়া হবে” (সূরা হা-মীম সিজ্‌দাহ : ৩১)।

মুমিনগণ জান্নাতে তাঁদের পুণ্যবান পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের সাথে মিলিত হবেন। তাঁরা জান্নাতের স্থায়ী নবজীবন লাভ করবেন। জান্নাতের সুখ-শান্তি বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। হাদীসে কুদসীতে আছে : আল্লাহ বলেছেন, “আমার নেক বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন সব পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানব হৃদয় কল্পনাও করতে পারেনি।”

চরম আনন্দানুভূতির কেন্দ্রস্থলে থাকবেন আল্লাহ। মুমিন বান্দা তাঁর দীদার লাভ করবেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে নিত্য সন্তোষ ও পরম প্রশান্তিতে চিরকাল বাস করবেন। আল্লাহ পাক তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁরাও আল্লাহকে পেয়ে সন্তুষ্ট হবেন।

জান্নাত লাভ করবেন কারা

কারা অফুরন্ত সুখের স্থান জান্নাত লাভ করবেন, এ সম্বন্ধে আল্লাহ পাক বলেন : “যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে (হিসাব-নিকাশের জন্য) দাঁড়াতে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে, তার ঠিকানা জান্নাত।” (সূরা আননাযিআত : ৪০-৪১)

জান্নাতের নাম

কুরআন মাজীদে জান্নাতের আটটি নামের উল্লেখ আছে। তা হল :

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| ১. জান্নাতুল ফিরদাউস, | ২. দারুল মাকাম, | ৩. জান্নাতুল মা'ওয়া, | ৪. দারুল কারার |
| ৫. দারুস সালাম | ৬. জান্নাতুআদন | ৭. দারুন নাদ্বিম | ৮. দারুল খুল্দ। |

৭. জাহান্নাম

আল্লাহর প্রিয়বান্দাদের জন্য যেমন চিরসুখের স্থান জান্নাত রয়েছে। ঠিক তার বিপরীত যারা আল্লাহকে প্রভু বলে স্বীকার করে না, ইবাদাত করে না বরং নাফরমানী করে, তাদের জন্য সীমাহীন কষ্টের স্থান জাহান্নাম রয়েছে। জাহান্নামকে ‘নার’ বা দোযখও বলে। জাহান্নামে কেবল দুঃখ আর দুঃখ। সেখানে আছে ভীষণ শাস্তি। পাপীরা জাহান্নামে ক্রমাগত অগ্নিদগ্ধ হবে। শরীরের চামড়া আর গোশত ঝলসে খসে পড়বে। আবার পরিবর্তন করে নতুন চামড়া ও গোশত দেওয়া হবে যাতে দাহনযন্ত্রণা শেষ না হয়। জাহান্নামীরা সেখানে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। অর্থাৎ এক কবুণ অবস্থায় থাকবে তারা। জাহান্নামবাসীরা উষ্ণ রক্ত ও পুঁজের সাগরে হাবুডুবু খাবে। যাক্কুম নামে জাহান্নামের এক কাঁটাময় দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভিদ হবে তাদের খাদ্য। তীব্র পিপাসায় তাদের পান করতে দেওয়া হবে হামীম অর্থাৎ অতি উত্তপ্ত পানি। আরও দেওয়া হবে পুঁজরক্ত মিশ্রিত দুর্গন্ধময় পানি। পাপীরা জাহান্নামে অনন্তকাল ধরে অগ্নিদগ্ধ হতে থাকবে। জাহান্নামের আগুনের দাহনক্ষমতা হবে অনেক বেশি। মহানবী (স) বলেছেন : “তোমাদের এ পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের একাত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।”

পাপীরা হিসাব-নিকাশের সময় আল্লাহর কাছে সকাভরে ফরিয়াদ জানাবে, “আমাদের দুনিয়ায় ফিরে যেতে দেওয়া হোক, আমরা পুণ্যের কাজ করে আসি।” তাদের সে ফরিয়াদ গ্রাহ্য হবে না। তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

ধনসম্পদ কোন কিছুর বিনিময়ে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর বিধান মেনে চলা এবং রাসূল (স)-এর প্রদর্শিত পথে জীবনযাপনের মাধ্যমেই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শেকড়ের সাথে গাছের পত্র-পল্লবের যেমন সম্পর্ক, ঈমানের সাথে ইসলামের তেমন সম্পর্ক। কিন্তু ফাহিম তার পাঠ্যবই থেকে এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারেনি।

৭। ফাহিমকে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হলে -

- ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞা জানতে হবে।
- কোনো বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হতে হবে।
- নবী রাসূলদের জীবন চরিত অধ্যয়ন করতে হবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

৮। নিচের কোন উদাহরণটি ঈমান-ইসলামের সম্পর্ক নির্ণয়ে যথার্থ হবে-

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ক. মেঘের সাথে বৃষ্টির | খ. প্রদীপের সাথে আলোর |
| গ. খেতের সাথে মাঠের | ঘ. কলমের সাথে কালির। |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শফিক এসএসসি পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার পূর্বে সে কোনো এক মাজারে পীরের নিকট দোয়া প্রার্থনা করতে গেল। শফিক প্রার্থনায় বলল, ‘বাবা আমি যেন পরীক্ষায় ভালোভাবে পাস করতে পারি’। মাজারে শফিক অন্য একজন ছাত্রকে সিঁজদা করতে দেখল। বাড়ি ফিরে শফিক একজন বিজ্ঞ আলেমের কাছে গিয়ে তাদের প্রার্থনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল এবং তিনি উত্তর দিলেন, “দুজনের প্রার্থনাই শির্ক হয়েছে।”

- শির্ক কী?
- দুজনের প্রার্থনাই শির্ক হওয়ার কারণ- ব্যাখ্যা কর।
- শফিক শির্ক না করে কীভাবে মাজারে প্রার্থনা করতে পারতো?
- ‘আল্লাহ শির্ক করার গুনাহ কখনও ক্ষমা করেন না’- এই আয়াতের আলোকে শফিকের কাজটি মূল্যায়ন কর।

২। হাসান করিমের কাছে পাঁচ হাজার টাকা আমানত রাখে। কয়েক মাস পরে হাসান ঐ আমানতের টাকা ফেরত আনতে গেলে করিম বলে যে, সে টাকাগুলো খরচ করে ফেলেছে। সাত দিন পরে টাকা ফেরত দিবে বলে অজ্ঞীকার করে। পরে নির্ধারিত তারিখে করিম আবার টাকা দিতে ব্যর্থ হলে দুইজনের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি একজন আলেমের কাছে বললে তিনি নিম্নোক্ত হাদীসটি পাঠ করে শুনান। ৩৫ পৃষ্ঠার ৪ নং হাদীস’

- মুনাফিকের লক্ষণ কয়টি?
- আমানতের খিয়ানত বলতে কী বোঝায়?
- উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে হাদীসটির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
- অর্থসহ হাদীসটির সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৩। অনেক বছর পর শফিকের সাথে নাফিসের দেখা হয়। নাফিস দেশে বিদেশে ব্যবসা করে। আসরের আযান দিলে শফিক বলে, চল দোস্ত, নামায পড়তে যাই। নাফিস বলে, বসো, পরে যাচ্ছি। শফিক নামায শেষ করে এসে জিজ্ঞেস করল - তুমি নামাযে এমন উদাসীন কী করে হলে? নাফিস বলে - এখন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। কাজ গুছিয়ে নেবার পর ভালো করে নামায পড়ব। শফিক বলল, কত বছর তুমি বেঁচে থাকবে তার গ্যারান্টি দিতে পার? পার না। অথচ তুমি জান হাদীসে আছে, ‘দুনিয়া হল আখিরাতের শস্যক্ষেত্র’।

- আখিরাত শব্দের অর্থ কী?
- আখিরাতে বিশ্বাস করা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
- আখিরাতের প্রতি নাফিসের বিশ্বাস কতটুকু - ব্যাখ্যা কর।
- ‘দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র’- অনুচ্ছেদের আলোকে হাদীসটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরীআত-এর উৎস

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত জীবনব্যবস্থা। এর বিধানদাতা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। এর শেষ প্রচারক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) মানুষের কল্যাণের জন্য ইসলামের বিধি-বিধান জারি করেছেন। এ বিধি-বিধানকেই বলা হয় শরীআত। আল্লাহ তাআলা এ শরীআতের পূর্ণতার ঘোষণা প্রদান করে বলেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (ط)

অর্থ : “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে মনোনীত করলাম।” (সূরা মায়িদাহ : ৩)

শরীআতের বিধি-বিধান অবিভাজ্য। এর কিছু অংশ গ্রহণ এবং কিছু অংশ বর্জন করা নিষেধ। শরীআতের প্রতিটি হুকুমের ওপর ঈমান আনা এবং সামগ্রিকভাবে শরীআত পালন করা অবশ্য কর্তব্য। শরীআতের কোন বিধানের বিরোধিতা বা লঙ্ঘন একই সঙ্গে দুইটি মারাত্মক পরিণতির কারণ। একটি ইহকালীন এবং অপরটি পরকালীন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন : “তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা গঞ্জন এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।” (আল-বাকার : ৮৫)

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শরীআতের কিছু অংশের অনুসরণ ও কিছু অংশ বর্জনের শাস্তি দুনিয়াতেও কঠোর এবং আখিরাতেও কঠিন।

শরীআতের উৎস চারটি : (ক) আল-কিতাব (কুরআন মাজীদ), (খ) সুন্নাহ, (গ) ইজ্মা ও (ঘ) কিয়াস।

প্রথম উৎস কুরআন মাজীদ

শরীআতের প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে কুরআন মাজীদ। কুরআন মাজীদ শরীআতের অকাট্য দলিল। এর ওপরই শরীআতের মূল কাঠামো দড়ায়মান। শরীআতের উৎস হিসেবে সুন্নাহর স্থান দ্বিতীয়। কারণ, কুরআন মূল আর সুন্নাহ এর ব্যাখ্যা। কুরআন মাজীদে সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, হাদীসে রয়েছে ঐসব বিষয়ের বিশ্লেষণ। আল্লাহ

পাক কুরআন সম্পর্কে বলেন- وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَیْءٍ ۝

অর্থ : এবং আমি আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ। (সূরা আননাহুল : ৮৯)

দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহ

শরীআতের দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহ। কুরআন মাজীদের সব সংক্ষিপ্ত বিষয়ের ব্যাখ্যাদানের দায়িত্ব ছিল মহানবী (স)-এর ওপর।

আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে বলেন- وَانْزَلْنَا اِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

অর্থ : “আর আমি আপনার নিকট কুরআন নাযিল করেছি, মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।” (সূরা আননাহুল : ৪৪)।

মহানবী (স)-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই হাদীস নামে অভিহিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস (সুন্নাহ) যে শরীআতের উৎস এ

কথা আল্লাহ পাক নিজের আয়াতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন-

وَمَا أَتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَاٰخُذُوْهُ (ق) وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (ع)

অর্থ : “রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। (সূরা আল-হাশার : ৭)

তৃতীয় উৎস ইজ্‌মা

শরীআতের তৃতীয় উৎস হচ্ছে ইজ্‌মা বা উম্মাতের ঐকমত্য। আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মাতকে এমন মর্যাদা দান করেছেন যে, এ উম্মাতের মুমিন ব্যক্তিগণ যদি কোন বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন তবে তাঁদের বিরোধিতা করা চরম পাপ।

আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন : “যে কেউ রাসূলের বিরোধিতা করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুমিনগণের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান।” (সূরা আননিসা : ১১৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) উম্মাতের ইজ্‌মার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন- مَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ -

অর্থ : “মুসলমানগণ যা ভাল বলে গ্রহণ করে তা আল্লাহ তাআলার কাছেও ভাল।” ()

চতুর্থ উৎস কিয়াস

শরীআতের চতুর্থ উৎস কিয়াস। মানব সমাজে নিত্যনতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটবে। কুরআন, সুন্নাহ্ অথবা ইজ্‌মার মধ্যে যদি এর সমাধান খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে কিয়াসের আলোকে তার সমাধান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-এর হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, “আল্লাহর কিতাবে যদি না পাও?” তিনি উত্তরে বলেন, “তাহলে নবীর সুন্নাহ্ অনুসারে।” রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করেন, “যদি তাতে না পাও? তিনি জবাবে বলেন, “তাহলে আমি আমার বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।” তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, “যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি তাঁর রাসূলের দূত দ্বারা এমন উত্তর দেওয়ালেন যাতে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট হলেন।” (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

কুরআন মাজীদ (قُرْآنٌ مَّجِيدٌ)

পরিচয়

কুরআন মাজীদ আল্লাহর বাণী। মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থসমূহের মধ্যে কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এটি আরবি ভাষায় নাযিল হয়। কারণ, মহানবী (স)-এর নিজের ভাষা এবং তাঁর কওমের ভাষা ছিল আরবি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (ط)

অর্থ : “আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষা-ভাষী করে প্রেরণ করেছি, তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।” (সূরা ইবরাহীম : ৪)

কুরআনের ভাষা সহজ ও সরল। এতে কোন বক্রতা নেই। নেই এতে কোন দূর্বোধ্যতা। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন-
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

অর্থ : “নিশ্চয়ই আমি এ কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।”
 (সূরা আদ দুখান : ৫৮)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

অর্থ : “নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে আরবি ভাষায় নাখিল করেছি, যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পার।” (সূরা ইউসূফ : ২)
 কুরআন-এর এক অর্থ পঠিত। পৃথিবীর সকল ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে এটি সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বলে একে কুরআন বলা হয়। অপর মতে কুরআন ‘কারউন’ ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ একত্রিত করা, জমা করা।

কুরআন মাজীদ পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সারবস্তু এবং পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান তার মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে বলেই তাকে কুরআন বলা হয়। আর এ কারণে তাকে আল-হাকীম ‘জ্ঞান ভাণ্ডার’ বলা হয়। কুরআন মাজীদের অনেক নাম রয়েছে। যেমন-

আল্-ফুরকান	(الْفُرْقَانُ)	সত্য মিথ্যা প্রভেদকারী।
আল-কিতাব	(الْكِتَابُ)	গ্রন্থ।
আযযিকুর	(الذِّكْرُ)	উপদেশ।
আত্‌তানযীল	(التَّنْزِيلُ)	অবতীর্ণ।
আননূর	(النُّورُ)	জ্যোতি, ইত্যাদি

অবতরণ

আল-কুরআন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর নাখিল হয়। এটি সুরক্ষিত লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ ছিল। এ

প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন-
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

অর্থ : “বরং এটা সম্মানিত কুরআন, যা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত।” (সূরা বুরূজ : ২১-২২)

লাওহে মাহফুয থেকে কাদর রাতে পৃথিবীর নিকটতম আসমান “বায়তুল ইয়্যাহ” নামক স্থানে সম্পূর্ণ কুরআন একই সাথে নাখিল হয়। এরপর সেখান থেকে রমযান মাসে জিবরাঈল (আ) ফেরেশতার মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট সূরা আলাকের শুরুর পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাখিল করা হয়। তখন তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন। তারপর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কুরআন নাখিল হওয়া বন্ধ থাকে। এরপর কুরআন খডাকারে নাখিল হতে থাকে। কখনও ৫ আয়াত, কখনও ১০ আয়াত, কখনও একটি আয়াতের অংশ বিশেষ এবং কখনও একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাখিল হয়। এভাবে অবস্থা, প্রয়োজন ও বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে মহানবীর ২৩ বছর নবুওয়্যাতি জীবনে কুরআন অবতীর্ণ হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন-

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝

অর্থ : “আর এ কুরআনকে অল্প অল্প করে নাখিল করেছি, যেন আপনি তা ক্রমে ক্রমে লোকদের শোনান, আর তা যথাযথভাবে নাখিল করেছি।” (সূরা বনী ইসরাইল : ১০৬)

এ প্রসঙ্গে কুরআনে আরও বলা হয়, “কাফিররা বলে, এ ব্যক্তির ওপর সমস্ত কুরআন একযোগে নাখিল করা হল না কেন? হ্যাঁ, এরূপ করা হয়েছে এ জন্য, যাতে এটি খুব ভালভাবে আপনার মন-মগজে বন্দ্বমূল হয়, আর (এ উদ্দেশ্যেই) একে এক বিশেষ ধারায় আলাদা আলাদা অংশে সুবিন্যস্ত করেছি।” (সূরা আল-ফুরকান : ৩২)

সংরক্ষণ

আরবদের মধ্যে অতি নগণ্য সংখ্যক লোক লেখাপড়া জানত। লেখার উপকরণও ছিল বিরল। কিন্তু তাদের স্মরণশক্তি ছিল অতি তীক্ষ্ণ। কুরআনের যে অংশ যখন নাখিল হত নবী কারীম (স) সাথে সাথে তা কণ্ঠস্থ করতেন। এমনকি ওহী নাখিল হওয়ার সময় তিনি জিবরাঈল (আ)-এর সাথে তাঁর দুই ঠোঁট নেড়ে মুখস্থ করতে চেষ্টা করতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, “তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্য আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব।” (সূরা কিয়ামা : ১৫, ১৬)

তিনি রাত দিন কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। সাহাবীগণকেও তা মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। সাহাবীগণ নিজেরা কুরআন হিফয করতেন, নিজেদের পরিবার পরিজনকে যত্নসহকারে মুখস্থ করাতেন। গভীর রাতে তাঁদের গৃহ থেকে তিলাওয়াতের গুন গুন রব উঠিত হত। নবী কারীম (স) রাতের অন্ধকারে সাহাবীগণের গৃহপার্শ্বে গিয়ে তাঁদের তিলাওয়াত শ্রবণ করতেন। তিনি কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাহাবীগণকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রেরণ করতেন। হিজরতের পূর্বে তিনি মুসআব ইব্ন উমাইর (রা) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)-কে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মদীনায় প্রেরণ করেন।

কুরআন মাজীদকে মুখস্থ করা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগেই তা সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। বিশিষ্ট সাহাবীগণের একটি দল ওহী লেখক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, যাসিদ ইব্ন সাবিত (রা), উবাই ইব্ন কাআব (রা), মুআয ইব্ন জাবাল (রা), আবু বকর (রা), উমার ফারুক (রা), উসমান (রা), আলী (রা) এবং মুআবিয়া (রা)।

তখনকার যুগে লেখার উপকরণ ছিল দুর্লভ। মুদ্রণযন্ত্র তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই সাহাবীগণ কুরআনের আয়াত খেজুরের ডাল, প্রস্তর খণ্ড, অস্থি, চর্ম, বৃক্ষের পত্র, কাগজ অথবা কাপড়ের টুকরা প্রভৃতি বস্তুর ওপর লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেন।

সংকলন

মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু তা ছিল বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে দ্বাদশ হিজরী সালে ইয়ামামা নামক স্থানে একটি রক্তক্ষয়ী জিহাদে ৭০ জন হাফিয়ে কুরআন শহীদ হন। এতে হযরত উমার (রা) উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তিনি খলীফা আবু বকর (রা)-কে বলেন, “এভাবে বিভিন্ন জিহাদে হাফিয়গণ শহীদ হতে থাকলে কুরআনের অধিকাংশ অংশ বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতএব আপনি কুরআন মাজীদ একত্রে সংকলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।” তখন আবু বকর (রা) বলেন, “হে উমার” আপনি এমন কাজ কি করে সম্পাদন করবেন যা রাসূলুল্লাহ (স) করেননি?” উমার (রা) তখন বললেন, “আল্লাহর শপথ। এতে কল্যাণ রয়েছে।” পরিশেষে আবু বকর (রা) ওহী লেখক যাইদ ইব্নে সাবিতকে এ গুরুদায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় লিখিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি থেকে কাগজের ওপর গ্রন্থকারে কুরআন লিপিবদ্ধ

করেন। এতে সময় লেগেছিল প্রায় এক বছর। এ গ্রন্থটি আবু বকর (রা)-এর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। তাঁর ওফাতের পর এটি হযরত উমার (রা)-এর হিফযতে থাকে। তাঁর শাহাদাতের পর তাঁরই ওসিয়্যাত অনুসারে কুরআনের এ কপিটি তাঁর কন্যা নবী কারীম (স)-এর স্ত্রী বিবি হাফসা (রা)-এর নিকট গচ্ছিত ছিল।

তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর যুগে ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইসলামের এ প্রসারের ফলে বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষী লোকেরা দলে দলে ইসলাম কবুল করেন। তাঁদের অনেকেই কুরাইশের পঠন পদ্ধতি অনুসরণে কুরআনের বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করতে পারতেন না। এছাড়া এক পঠন পদ্ধতির অনুসারীরা অপর পঠন পদ্ধতির অনুসারীদের ভ্রান্ত পাঠকারী বলে অভিহিত করে। বিশেষ করে আরমেনিয়া এবং আযারবাইজান যুদ্ধে সমবেত মুসলমানদের কুরআন পাঠ পদ্ধতির বিভিন্নতা দেখে বিশিষ্ট সাহাবী হুযাইফা (রা) ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-কে বিষয়টি অবহিত করেন। তিনি অবিলম্বে এ নিয়ে নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে কুরআনের একটি প্রামাণ্য সংস্করণ তৈরি করার জন্য চার জন বিশিষ্ট সাহাবী সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন। এ চার জন সাহাবী হচ্ছেন, যাইদ ইব্ন সাবিত (রা), আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা), সাঈদ ইব্ন আস (রা) এবং আবদুর রহমান ইব্ন হারিস (রা)।

হযরত উসমান (রা)-এর এ উদ্যোগ হিজরী ২৪ সালে গৃহীত হয়। এ বোর্ড হাফসা (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত কপি থেকে সাতটি প্রতিলিপি তৈরী করেন। প্রতিলিপি তৈরিকারকগণও প্রত্যেকে ছিলেন কুরআনের হাফিয। তাঁরা প্রতিলিপি তৈরি করার সময় বিভিন্ন হাফিযের কিরাআত শ্রবণ করতেন। এ কারণে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব তাঁদের লিখিত প্রতিলিপিগুলোকে নির্ভুল বলে গ্রহণ করেন। মূল কপিটি হযরত হাফসা (রা)-কে ফেরত দেওয়া হয়। লিখিত প্রতিলিপিগুলোর একটি খলীফার নিকট কেন্দ্রে সংরক্ষিত রাখা হয় এবং অবশিষ্টগুলো বিভিন্ন শাসন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়, যাতে কুরআন পাঠে কোনরূপ গরমিল না হয়। এরপর বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত কপিগুলো সকলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। এভাবে ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পবিত্র কুরআন সংগৃহীত হয়। তাঁর এ মহান কাজের জন্য তাঁকে ‘জামিউল কুরআন’ বা কুরআন সংগ্রহকারী বলা হয়।

কুরআনের এ সংগ্রহে আল্লাহর হুকুম অনুসারে মহানবী (স) কর্তৃক সাজানো আয়াত ও সূরাসমূহের কোন পরিবর্তন করা হয় নি। কেননা আয়াতের ক্রমধারা রক্ষা করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ) কুরআনের যে অংশ যখন নিয়ে আসতেন তা কোন সূরায় কোন স্থানে সংযোজন করতে হবে তা তিনি বলে দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ (স) তখন ওহী লেখক সাহাবীকে ডেকে অবতীর্ণ অংশকে সংশ্লিষ্ট সূরার নির্দিষ্ট স্থানে সংযোজন করার নির্দেশ দিতেন। অনুরূপভাবে সূরাসমূহের ক্রমধারাও আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রয়েছে নির্ধারিত। বর্তমানে কুরআন মাজীদের সূরাগুলো ঠিক ঐভাবেই সজ্জিত রয়েছে, যেভাবে লাওহে মাহফুযে কুরআন সংরক্ষিত আছে।

এ সময়ে কুরআন মাজীদে হরকত বা স্বরচিহ্ন ছিল না। এতে পরবর্তীকালে অনারব মুসলমানগণ কুরআন পাঠে অসুবিধার সম্মুখীন হন। তখন ইরাকের উমাইয়া বংশীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ কুরআন মাজীদে হরকত সংযোজনের ব্যবস্থা করে এ অসুবিধা দূর করেন।

মাক্কী-মাদানী সূরা

কুরআন মাজীদ ত্রিশ পারায় বিভক্ত। এতে ১১৪টি সূরা এবং মোট ৬২৩৬টি আয়াত আছে। মতান্তরে মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। অবতরণের সময়ের প্রেক্ষিতে সূরাগুলোকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয় : মাক্কী ও মাদানী।

মাক্কী ও মাদানী সূরা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ মতটি এরূপ :

হিজরতের পূর্বে যে সকল সূরা নাযিল হয়েছে সেগুলোকে মাক্কী সূরা বলা হয়। আর হিজরতের পরে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে সেগুলোকে মাদানী সূরা বলা হয়। এ প্রসঙ্গে ইয়াহুইয়া ইব্ন সালাম বলেন, “মহানবী (স)-এর হিজরত কালে

মদীনায় গমনের পথে মদীনায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত যা নাযিল হয় তাও মাক্কী, আর তাঁর মদীনায় আগমনের পর মদীনায় বাইরে সফরে থাকা অবস্থায় যা নাযিল হয় তাও মাদানী সূরা। ”

মক্কায় অবতীর্ণ সূরার সংখ্যা ৮৬টি এবং মদীনায় অবতীর্ণ সূরার সংখ্যা ২৮টি।

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য

১. মাক্কী সূরায় তাওহীদ এবং রিসালাতের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।
২. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, জীবনের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ, কিয়ামতের বিভীষিকা এবং জান্নাতের অনুপম শান্তি ও জাহান্নামের কঠোর শাস্তির বর্ণনা এতে প্রাধান্য লাভ করেছে।
৩. এতে শরীআতের সাধারণ নীতিমালা এবং উত্তম চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা রয়েছে।
৪. এতে মুশরিকদের রক্তপাত ও হত্যাযজ্ঞের কাহিনী, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ ভক্ষণ, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত দাফন প্রভৃতি কুপ্রথা ও কু-আচরণের বিবরণ রয়েছে।
৫. এতে পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাঁদের অব্যাহত উম্মাতের করুণ পরিণতির কাহিনী বিবৃত হয়েছে।
৬. মাক্কী সূরা আকারে ছোট, কিন্তু অতীব ভাবগম্ভীর। এর শক্তিশালী শব্দমালা কর্ণে ঝংকার এবং অন্তরে প্রকম্পন সৃষ্টি করে।
৭. এতে প্রসিদ্ধ বস্তুসমূহের শপথের মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে।

মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য

১. মাদানী সূরায় ইবাদাত, সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পরস্পরের লেনদেন, হালাল-হারাম, উত্তরাধিকার আইন, জিহাদের ফযীলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, পররাষ্ট্র-নীতি, বিচার-ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সমষ্টিগত জীবনের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের উল্লেখ রয়েছে।
২. মাদানী সূরায় বিশেষভাবে আহ্লে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান হয়েছে।
৩. এতে আহ্লে কিতাবদের সত্যবিমুখতার কথা এবং তাদের কিতাব বিকৃতি সাধনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।
৪. এতে মুনাফিকদের কপট আচরণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন করা হয়েছে।
৫. মাদানী আয়াত ও সূরা দীর্ঘ। এতে শরীআতের বিধি-বিধানকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

নাযিরা তিলাওয়াত

কুরআন মাজীদ দেখে দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলা হয়। দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম। এতে অধিক নেকী পাওয়া যায়। কুরআন মাজীদ শিখতে হলে প্রথমে দেখে দেখে এবং প্রত্যেক হরফের সঠিক উচ্চারণ জেনে পড়তে হবে। যে ঘরে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত হয় সে ঘরে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তির মর্যাদা অনেক। এমনকি যে কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে যায় এবং তিলাওয়াত তার জন্য কষ্টসাধ্য হয় তাকেও আল্লাহ তাআলা কুরআন পাঠে দ্বিগুণ সওয়াব দেবেন বলে প্রিয়নবী (স) উল্লেখ করেছেন। আর যে অন্তরে কুরআন মাজীদের একটি আয়াতও নেই মহানবী (স) সে অন্তরকে একটি শূন্য ঘরের সাথে তুলনা করেছেন। কাজেই আমরা সর্বদা দেখে দেখে শৃঙ্খলভাবে কুরআন তিলাওয়াত করব।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত

তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা, অনুসরণ করা, অনুধাবন করা। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদ নাযিল করেছেন মানব জাতিকে সঠিক ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্য। এ কুরআন মানুষের সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, জান্নাত-জাহান্নাম এবং ইহকাল-পরকাল সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা তুলে ধরেছে। আল-কুরআন মানবজাতির মুক্তির সনদ এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণের ধারক ও বাহক। মহানবী (স)-এর নবুওয়াতের প্রধানতম দায়িত্ব ছিল কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে শোনান। কুরআন মাজীদ সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। এমন কোন বিষয় নেই যার তথ্য কুরআন মাজীদে পরিবেশিত হয় নি। এক জন ফরাসি পণ্ডিত যথার্থই মন্তব্য করেছেন, “কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দ কোষ, বৈয়াকরণের জন্য একখানা ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং বিধানের জন্য একটি বিশুকোষ।” এসব বিষয়ে সম্যক উপলব্ধির জন্য কুরআন মাজীদের অর্থ অনুধাবন করতে হবে, এর উপস্থাপিত বিষয় নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে হবে এবং একাগ্রচিত্তে এর পাঠে আত্মনিয়োগ করতে হবে। যারা এভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে না

আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে বলেন- **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا**

অর্থ : “তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?” (সূরা মুহাম্মাদ : ২৪)

কুরআন নাযিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য তখনই সাধিত হবে যখন আমরা একে বুঝে তিলাওয়াত করতে থাকব। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন- “এটি একটি কল্যাণময় কিতাব যা আমি আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীগণ যেন উপদেশ গ্রহণ করে।” (সূরা সাদ : ২৯)

তাজবীদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করা অত্যাবশ্যক। কুরআনের প্রত্যেক হরফকে তার উচ্চারণস্থল থেকে সিফাত (হরফের উচ্চারণের বিশেষ অবস্থা) সহকারে পড়ার নাম তাজবীদ। ভুল তিলাওয়াত করলে গুনাহ হয়। তাজবীদ সহকারে এবং সুন্দর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ দিয়েছেন।

নবী কারীম (স) বলেন- **لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ**

অর্থ : “যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না সে আমার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।” (আবু দাউদ)

আল্লাহ রাক্বুল আলামীন স্বয়ং মধুর কণ্ঠের তিলাওয়াত শ্রবণ করেন।

কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত অনেক। এ প্রসঙ্গে নবী কারীম (স) বলেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

অর্থ : “যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ তিলাওয়াত করে সে নেকী পেল, আর এ নেকীর পরিমাণ হচ্ছে দশ গুণ।” (তিরমিযী)।

তিনি আরও বলেন, “যে ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, আসমানবাসীগণের নিকট সে ঘরটি এমন উজ্জ্বল দেখায় যেমন যমীনের অধিবাসীদের নিকট নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল দেখায়।” (বায়হাকী)

অন্য হাদীসে আছে- “তোমরা আপন ঘরগুলোকে সালাত এবং কুরআন পাঠদ্বারা আলোকোজ্জ্বল করে তোল।” (বায়হাকী)

কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদাত। এ প্রসঙ্গে নবী কারীম (স) বলেন-

أَفْضَلُ عِبَادَةٍ أَمَّتِي قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

অর্থ : “আমার উম্মাতের সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ ইবাদাত হচ্ছে কুরআন পাঠ।” (বায়হাকী)

কুরআন তিলাওয়াতের ওপর জাতির সফলতা নির্ভর করে। এ সফলতা তখন আসবে যখন আমরা কুরআন বুঝে শুনে পড়ব এবং কুরআনের হুকুম সমাজে বাস্তবায়িত করব। কুরআন অধ্যয়ন করে যে ব্যক্তি কুরআনের ওপর আমল করবেন কিয়ামতের দিন তাঁর মাতাপিতাকে এমন একটি মুকুট পরানো হবে যার কিরণ সূর্যের কিরণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল হবে। আর আমলকারীর মর্যাদা এত বেশি হবে যা আমরা এখন ভাবতেই পারি না।

আমরা সদা সর্বদা যত্ন সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করব, বুঝতে চেষ্টা করব এবং সে অনুসারে কাজ করব।

শানে নুযূল

শান অর্থ অবস্থা, কারণ, ঘটনা, প্রেক্ষিত আর নুযূল মানে অবতরণ। কুরআন মাজীদেবের আয়াত ও সূরা কোন না কোন ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। যে ঘটনা ও অবস্থাকে কেন্দ্র করে আয়াত ও সূরা নাযিল হয়েছে তাকে সে আয়াত বা সূরার শানে নুযূল বলা হয়।

শানে নুযূল জানার উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নিম্নরূপ :

১. শরীআতের বিধান প্রবর্তনের রহস্য জানা যায়।
২. আয়াতের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা যায় এবং অর্থের জটিলতার অবসান ঘটে।

সূরা আদুহা (سُورَةُ الضُّحَى)

(মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা- ১১)

শানে নুযূল

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, এক বার রাসূলুল্লাহ (স) অসুস্থ থাকার কারণে পরপর তিন রাত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে পারেন নি। এ সময় জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করেননি। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে, মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁর আল্লাহ পরিত্যাগ করেছে এবং তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়েছে। অপর দিকে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল এসে নবী কারীম (স)-কে বলল “হে মুহাম্মাদ! আমার মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে। দুই বা তিন রাত আমি তাকে তোমার কাছে আসতে দেখছি না।” তখন আল্লাহ তাআলা এ সূরাটি নাযিল করেন।

শব্দার্থ

الضُّحَى -	পূর্বাহ্ন, দিবসের প্রথম ভাগ।	اٰخِرَةٌ -	পরকাল।
وَ -	এবং।	خَيْرٌ -	উত্তম
لَيْلٍ -	রাত।	لَكَ -	আপনার জন্য।
سَجَى -	নিঝুম রাত।	اَلْاَوَّلَى -	প্রথম, ইহকাল।
اِذَا -	যখন।	سَوْفَ -	অতি শীঘ্র
مَا وَدَّعَ -	তিনি পরিত্যাগ করেননি।	يُعْطِيكَ -	আপনাকে দান করবেন
وَمَا قَلَى -	এবং তিনি অসন্তুষ্ট হননি।	تَرْضَى -	আপনি সন্তুষ্ট হবেন
لَ -	অবশ্যই।	اَلَمْ يَجِدْكَ -	তিনি কি আপনাকে পাননি?

يَتِيْمًا - অনাথ, ইয়াতীম, আশ্রয়হীন।	عَائِلًا - অভাবগ্রস্ত।
فَأَوَى - অনন্তর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন	أَعْنَى - ধনী বানালেন।
وَجَدَ - পেয়েছেন।	لَا تَقْهَرُ - কঠোর হবেন না।
رَبِّ - প্রতিপালক।	سَائِلَ - প্রার্থনাকারী, ভিক্ষুক।
كَ - আপনাকে।	لَا تَنْهَرُ - ধমক দিবেন না।
ضَالًّا - পথহারা।	نِعْمَةً - অবদান, ধনদৌলত।
هَدَى - পথ প্রদর্শন করেছেন।	حَدَّثَ - বর্ণনা করুন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

অনুবাদ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. শপথ পূর্বাহ্নের

২. শপথ রাতের, যখন তা নিঝুম হয়।

৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।

৪. নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।

৫. আর অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

৬. তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? এরপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।

৭ এবং তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, এরপর তিনি পথের নির্দেশ দেন।

৮. এবং তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব অবস্থায়, এরপর অভাবমুক্ত করেন।

৯. অতএব, আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না।

১০. কোন প্রার্থীকে ধমক দেবেন না।

১১. আর আপনি আপনার রবের নিআমতের কথা প্রকাশ করুন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১ - وَالضُّحَى ۝

২ - وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۝

৩ - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ۝

৪ - وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۝

৫ - وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝

৬ - أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى ۝

৭ - وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۝

৮ - وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۝

৯ - فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُقْهَرُ ۝

১০ - وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۝

১১ - وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

শিক্ষা

আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণের প্রতি তাঁদের জন্মলগ্ন থেকে অবিরত ধারায় করুণা বর্ষণ করে থাকেন। আমাদের নবী কারীম (স) ইয়াতীম ছিলেন, আল্লাহ তাঁকে লালন-পালনের সুব্যবস্থা করেছেন। তিনি সত্যের সন্ধানে ছিলেন, আল্লাহ তাঁকে পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি দরিদ্র ছিলেন, আল্লাহ তাঁকে সচ্ছল করেছেন। এ সূরায় তাঁর প্রতি আল্লাহর প্রদত্ত এসব

অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন ইয়াতীমের প্রতি কঠোর না হন, প্রার্থীকে ধমক না দেন এবং আল্লাহর নিআমতকে প্রকাশ করেন।

এ সূরা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়

১. আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের কখনও বর্জন করেন না। বিপদ যতই কঠিন হোক তিনি তাঁদের বিপদের অবসান ঘটাবেন।
২. যখন তিনি কোন ব্যক্তিকে ধন-দৌলত, মান-সম্মান ইত্যাদি দান করেন তখন তাঁকে গরিব-দুঃখীর কষ্ট লাঘবে এগিয়ে আসতে হবে।
৩. ভিক্ষুকদের তিরস্কার না করে যথাসম্ভব তাদের সাহায্য করতে হবে। কারণ, আল্লাহ ধনীদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের অংশ রেখেছেন। যাকাত, সাদকা, দান-খয়রাত প্রভৃতি দ্বারা ধনী-নির্ধনের দূরত্ব কমানো যায়।
৪. ধন-দৌলত আল্লাহর নিআমত। তিনি যখন কাউকে এ নিআমত দান করেন, তখন তাঁকে কৃপণতা বর্জন করে এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।
৫. জ্ঞান-বিজ্ঞানও আল্লাহ পাকের মহা দান, যাঁরা জ্ঞান লাভে ধন্য হয়েছেন, শিক্ষার আলোতে নিজেদের বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের কর্তব্য অন্যদেরকে অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। নিরক্ষরতা ও মূর্খতা জাতির জন্য অভিশাপ, সমাজ থেকে এ মূর্খতা ও নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে সমাজের প্রত্যেক শিক্ষিত ও জ্ঞানীদের এগিয়ে আসা অপরিহার্য কর্তব্য।

সূরা আল-ইনশিরাহ (سُورَةُ الْإِنشِرَاحِ)

(মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা- ৮)

শানে নুযূল

নবুওয়্যাত লাভের পূর্বে মক্কার লোকেরা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সম্মান করত। তাঁকে আল-আমীন বলে ডাকত। শ্রদ্ধার সাথে তাঁর কথা শুনত। কিন্তু ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করার পর মক্কাবাসীরা তাঁর প্রতি ঠাট্টা ও বিদ্রূপ শুরু করে। মক্কার কাফির মুশরিক তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়। তাঁকে নিঃস্ব বলে উপহাস করতে থাকে। তাঁকে এবং সাহাবীগণকে নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে। তাদের অত্যাচার ও নির্যাতনে মহানবী (স) উদ্বিগ্ন ও হতাশ হয়ে পড়েন। এ সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাঁর নবীকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ সূরাটি নাযিল করেন।

শব্দার্থ

أ - কি?
لَمْ نَشْرَحْ - আমি প্রশস্ত বা উন্মুক্ত করিনি?
لَكَ - আপনার জন্য।
صَدْرٌ - বক্ষ।
كَ - আপনার।
وَضَعْنَا - আমি অপসারণ করেছি।

ظَهَرَكَ - আপনার পৃষ্ঠদেশ।
رَفَعْنَا - উচ্চ করেছি।
ذَكَرَكَ - আপনার খ্যাতি, আলোচনা।
إِنَّ - নিশ্চয়।
عُسْرٌ - কষ্ট, বিপদ।
يُسْرٌ - স্বস্তি, শান্তি।

عَنْكَ - আপনার থেকে।	فَرَعْتَ - আপনি অবকাশ পান।
وَزَّرَ - বোঝা।	فَانْصَبَ - পরিশ্রম করুন, ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করুন।
الَّذِي - যা।	إِلَى - দিকে।
أَنْقَضَ - ভেঙে দিয়েছে, নুইয়ে দিয়েছে।	فَارْغَبَ - অনন্তর মনোনিবেশ করুন।

অনুবাদ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ০

১. আমি কি আপনার কল্যাণে আপনার বক্ষ প্রশস্ত করি নি? ۱ - أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝
২. এবং আপনার থেকে বোঝা অপসারণ করেছি। ২ - وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝
৩. যা আপনার পৃষ্ঠদেশকে নুইয়ে দিয়েছে। ৩ - الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝
৪. এবং আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। ৪ - وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝
৫. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। ৫ - فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝
৬. অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। ৬ - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝
৭. অতএব, আপনি যখনই অবসর পান, তখনই ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করুন। ৭ - فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝
৮. এবং আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন। ৮ - وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

শিক্ষা

নবুওয়্যাত লাভের পূর্বে মহানবী (স) আরবের তৎকালীন কাফির, মুশরিক, খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীদের ধর্মবিশ্বাসকে ভুল ও মিথ্যা মনে করতেন। কিন্তু তিনি নিজেও সঠিক পথের সন্ধান জানতেন না। এ কারণে তিনি সদা উদ্ভিগ্ন ও অস্থির ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়্যাত দান করে এ অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁর মন উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করলেন। তাঁকে অপূর্ব সাহসিকতা, দৃঢ় মানসিকতা ও হৃদয়ের উদারতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করলেন।

আরব সমাজের অন্যায়-অত্যাচার, নীতিবিবর্জিত কার্যকলাপ ও চরিত্রহীনতার দৃশ্য মহানবী (স)-কে চিন্তাক্লিষ্ট করে তোলে। কিন্তু সমাজ থেকে এসব দূর করার সঠিক পথ তাঁর জানা ছিল না। বস্তুত এ দুশ্চিন্তাই ছিল তাঁর হৃদয়ের ওপর চাপানো দুঃখসহ বোঝা। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবী-রাসূল করে সমাজ থেকে এসব অনাচার দূর করার উজ্জ্বল পথ প্রদর্শন করেন। নবী কারীম (স) জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত আরব জাতিকে হেদায়াতের আলোর পথে আহ্বান জানালেন। তারা সহজে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। অল্প সংখ্যক সাহাবী ছাড়া সকলেই তাঁর বিরোধিতা শুরু করে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ইসলামের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আরবের এমন কোনো গোত্র ছিল না যেখানে নবীর

নাম পৌছেন। তখন সমগ্র আরব তাঁর শত্রুতা ও বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে। নবী কারীম (স) এবং সাহাবীগণ তাদের অকথ্য যুগ্ম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। আল্লাহ তাআলা এ সময় নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এ কঠিন ও সংকটপূর্ণ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হবে না বরং অতিশীঘ্র এর অবসান ঘটবে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে বলেন, যখন ইসলাম প্রচার, সাথীদের প্রশিক্ষণ, পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি থেকে অবসর হবেন, তখন তিনি যেন আল্লাহর ইবাদাত এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

এ সূরা শিক্ষা দেয়

১. সত্য ও ন্যায় উপলব্ধি করার জন্য আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রচেষ্টা চালালে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরকে উন্মুক্ত করে দেন।
২. বিদ্যার্জনে ও জ্ঞান আহরণে যথার্থভাবে ব্রতী হলে জ্ঞানের দ্বার তাঁর জন্য অব্যাহত হয়।
৩. সমাজের বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, অরাজকতা, পাপ-পঙ্কিলতা বিবেকবান ব্যক্তিকে বিমর্ষ করে তোলে। এসব দূর করতে গিয়ে তাঁকে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে হতে পারে, কিন্তু তখন তাঁর নিরুৎসাহিত হওয়া ঠিক হবে না। কেননা, অন্যায় কখনও স্থায়ী হয় না। বরং সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।
৪. জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতি মূল্যবান। আর এ পৃথিবীর দায়-দায়িত্ব এবং কর্তব্য অসীম। সঠিকভাবে এসব দায়িত্ব পালন করা ইবাদাতের শামিল।
- ৫। ঝামেলা ও ব্যস্ততার অবসানের পর আল্লাহর ইবাদাত ও তাঁর স্মরণে আত্মনিয়োগ করা ঈমানদার ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য। এতে মনে প্রশান্তি আসে এবং আত্মার উন্নতি সাধিত হয়।

সূরা আতীন (سُورَةُ التَّيْنِ)

(মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা-৮)

শানে নুযূল

এ সূরায় দুইটি অতি উপকারী বৃক্ষ ও ফল এবং দুইটি পবিত্র স্থানের নামে শপথ করা হয়েছে। বৃক্ষ দুইটি হল আঞ্জীর এবং যায়তুন। আঞ্জীর বৃক্ষের ফল অতি উপাদেয়। আর যায়তুনের ফল বরকতময় এবং এর তেল অত্যন্ত উপকারী। তুর পর্বত হযরত মূসা (আ)-এর আল্লাহ তাআলার সাথে কথোপকথন স্থল আর বালাদুল আমীন হচ্ছে মক্কা শরীফ, যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মস্থান। এখানেই আল-মাসজিদুল হারাম অবস্থিত, যেখানে সকল রক্তপাত নিষিদ্ধ। এ সূরায় মহিমাবিত এ স্থানগুলোর উল্লেখ করে মানবজাতিকে ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

মানুষ আকৃতিগতভাবে অতি সুন্দর। অতএব তার কার্যকলাপ হবে অতি উত্তম। মানুষ যদি অসৎ কর্মে লিপ্ত হয় তবে এর শাস্তি অতি কঠোর। আর যাঁরা সৎকর্মশীল তাঁদের পুরস্কার অফুরন্ত। এ প্রসঙ্গেই এ সূরাটি নাযিল হয়।

শব্দার্থ

التَّيْنِ	- আঞ্জীর বা ডুমুর জাতীয় ফল।	اٰمَنُوْا	- ঈমান এনেছে।
الرَّيْتُوْنِ	- যায়তুন, জলপাই জাতীয় ফল।	عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ	- সৎকর্ম করেছে।
طُوْرٍ	- তুর পাহাড়।	لَهُمْ	- তাদের জন্য।
سَيِّئِيْنَ	- সিনাই পর্বত। ফলদার বৃক্ষ সম্বলিত পর্বতকে সিনীন এবং সায়না বলা হয়।	اٰجْرٍ	- পুরস্কার, প্রতিদান।
اِلٰنَسٰنٍ	- মানুষ জাতি।	غَيْرُ مَمْنُوْنٍ	- অশেষ, অব্যাহত।
تَقْوِيْمٍ	- আকৃতি, গঠন।	مَا يَكْذِبُكَ	- কিসে আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে?

ثُمَّ	- পুনরায়, অনন্তর।	الْيَوْمِ	- কিয়ামত দিবস, প্রতিফল দিবস, জীবনবিধান, ধর্ম।
وَمِنْ	- তাকে।	أَسْفَلَ	- সর্বনিম্ন।
رَدَدْنَاهُ	- আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি।	إِلَّا	- তবে, ব্যতীত।
الَّذِينَ	- যারা।	أَحْكَمَ	- শ্রেষ্ঠ বিচারক।
		الْحَكَمِينَ	- বিচারকগণ।

অনুবাদ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ০

১. শপথ তীন (আঞ্জীর) ও যায়তূনের। ۱ - وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ۝
২. আরও শপথ সিনাই পর্বতের। ۲ - وَطُورِ سَيْنِينَ ۝
৩. এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর (মক্কা নগরের)। ۳ - وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝
৪. নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অতি উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি। ۴ - لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝
৫. এরপর আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি সর্বনিম্ন স্তরে। ۵ - ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝
৬. কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য তো রয়েছে অশেষ পুরস্কার। ۶ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝
৭. অনন্তর (হে নবী) এরূপ অবস্থায় প্রতিফল দিবস সম্পর্কে কিসে আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে? ۷ - فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ۝
৮. আল্লাহ কি বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন? ۸ - أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ ۝

এ সূরায় আঞ্জীর, যায়তুন, সিনাইপর্বত এবং নিরাপদ শহর মক্কা নগরীর নামে শপথ করা হয়েছে। তীন ও যায়তুন দ্বারা এ দুইটি ফল অধিকহারে উৎপাদনকারী অঞ্চল সিরিয়া ও ফিলিস্তিনকে বোঝান হয়েছে। এ দুইটি অঞ্চলে হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে শুরু করে ঈসা (আ) পর্যন্ত অসংখ্য নবীর আগমন ঘটেছে। তুর পাহাড়ে হযরত মুসা (আ)-কে নবুওয়্যাত দান করা হয়েছে। আর মক্কা নগরীর ভিত্তিই স্থাপিত হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর হাতে।

এ সূরায় আমাদের শিক্ষা দেয়

১. আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে অতি উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছেন। যথার্থই মানুষের গঠন অতুলনীয়।
২. আল্লাহ তাআলা মানুষকে অতি সুন্দর আকৃতিতে তৈরী করার পর তাদের জ্ঞানে বিভূষিত করেছেন। এ জ্ঞানের বলেই মানুষ সমগ্র সৃষ্টির সেরা বিবেচিত হয়েছে, তার চেয়ে অধিক শক্তির অধিকারীকেও নিজের অনুগত করেছে।
৩. যখন মানুষ নিজ দেহ ও শক্তিকে অন্যায় ও পাপের কাজে প্রয়োগ করে তখন সে ধীরে ধীরে অধঃপতনের এমন অতল তলে নিমজ্জিত হয় যার নিচে আর কোন স্তর নেই। মানব সমাজে এরূপ ঘটনা ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, হিংসা-দ্বेष, ক্রোধ, মানুষকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে তখন চতুষ্পদ জন্তু থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। চতুষ্পদ জন্তু আপন নখর, পাঞ্জা ও দাঁত দিয়ে তার

- শত্রুকে আক্রমণ করে। কিন্তু মানুষ জিহাংসার বশবর্তী হয়ে খুন-খারাবি করে এবং মারাত্মক মারণাস্ত্র ব্যবহার করে নিমেষে জনপদ ধ্বংস করে দেয়। মানুষের এ হিংস্রতা ও বর্বরতার সাথে কোন হিংস্রজন্তুর তুলনা হয় না।
৪. যারা মুমিন এবং নেককার তাঁরা এ পর্যায়ে পৌঁছেন না। আল্লাহ তাআলা তাঁদের যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন তাঁরা তা রক্ষা করে চলেন। তাঁদের চরিত্র হয় উন্নত। তাঁরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দয়াদর্দ হৃদয়ের হয়ে থাকেন।
৫. মানবজাতির এ দুইটি শ্রেণীর কর্মফল ও পরিণতি এক নয়। সর্বনিম্ন স্তরের গুনাহে পতিত মানুষের জন্য শাস্তি এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির জন্য পুরস্কার অবধারিত।
৬. উপযুক্ত শাস্তি এবং যথার্থ পুরস্কার প্রদানের স্থান এ পৃথিবী নয়, কাজেই আখিরাত অঙ্গীকার করার কোন যুক্তি ও উপায় নেই।
৭. অপরাধীকে কঠিন শাস্তির এবং পুণ্যবান ব্যক্তিকে কল্লনাভীত পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন মহাবিচারক আল্লাহ তাআলা।
৮. কোন বিবেকবান ব্যক্তি আখিরাতের বিচারকে অঙ্গীকার করে মহানবী (স)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে না। কেননা আল্লাহ তাআলা সকল বিচারকের মহাবিচারক।

সূরা আল-কাদর (سُورَةُ الْقَدْرِ)

(মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াতের সংখ্যা-৫)

শানে নুযূল

কুরআন মাজীদে মাহাত্ম্য, গুরুত্ব ও মর্যাদা বোঝানোই এ সূরা নাযিলের মূল উদ্দেশ্য।

এ সূরার শানে নুযূল প্রসঙ্গে ইব্ন আবী হাতিমের রিওয়াতে বর্ণিত আছে, “এক দিন রাসূলুল্লাহ (স) বনী ইসরাঈলের এমন চার জন মহান ব্যক্তির কথা আলোচনা করলেন যাঁরা আশি বছর ধরে আল্লাহর ইবাদাত করেছেন। তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর নাফরমানী করেন নি। এ চার জন ছিলেন, হযরত আযুব (আ), যাকারিয়া (আ), হযকীল (আ) এবং ইউশা ইব্ন নূন (আ)। এ কথা শুনে সাহাবীগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন। কারণ পূর্ববর্তী নবী এবং তাঁদের উম্মাতগণ দীর্ঘায়ু লাভ করার কারণে বহু বছর আল্লাহর ইবাদাত করার সুযোগ পেতেন। কিন্তু মহানবী (স) এবং তাঁর উম্মাতের আয়ু অনেক কম হওয়ায় তাঁদের পক্ষে আল্লাহর ইবাদাত করে পূর্ববর্তীদের সমকক্ষ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সাহাবীগণের এ আক্ষেপের প্রেক্ষিতে তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) মহানবীর নিকট আগমন করে বলেন, আপনার উম্মাত এ চার ব্যক্তির ইবাদাতের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়েছেন। আল্লাহ এর চেয়েও উত্তম বস্তু আপনাদের জন্য দান করেছেন। এরপর তিনি সূরা কাদর তিলাওয়াত করে শুনান।

শব্দার্থ

إِنَّا	- নিশ্চয়ই আমি।	مَا	- কি?
أَنزَلْنَاهُ	- এটি নাযিল করেছি।	خَيْرٌ	- উত্তম, সর্বোত্তম।
لَيْلَةٍ	- রজনী।	أَلْفٌ	- সহস্র।
الْقَدْرُ	- মর্যাদা, মহান।	شَهْرٌ	- মাস।
وَمَا أَدْرَاكَ	- আপনি জানেন কি?	تَنَزَّلُ	- অবতরণ করে।
مَلَكُهُ	- ফেরেশতাগণ।	وَالرُّوحُ	- জিবরাঈল (আ)। হাদীসে আছে, শবে কাদরে জিবরাঈল

(আ) ফেরেশতাদের এক বিরাট দল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং ইবাদাতে মশগুল সকল নারী পুরুষের জন্য রহমতের দুআ করেন।

بِإِذْنِ	- আদেশক্রমে।	هِيَ	- তা।
كُلِّ	- সকল।	حَتَّى	- পর্যন্ত।
أَمْرٍ	- ঘটনা।	مَطْلَعِ	- উদয়।
سَلَامٍ	- শান্তি, মঙ্গল।	الْفَجْرِ	- ভোর, প্রভাত।

অনুবাদ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ০

১. নিশ্চয়ই আমি একে (কুরআনকে) নাযিল করেছি কাদরের রাতে।

۱ - إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

২. এবং আপনি কি জানেন এ কাদরের রাতটি কেমন?

۲ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝

৩. কাদরের রাত সহস্র মাস অপেক্ষা অধিক উত্তম।

۳ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَاحِظٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

৪. এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ তাঁদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে
সব কাজে অবতীর্ণ হন।

۴ - تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝

৫. শান্তিই শান্তি, সে রাতের প্রভাত উদয় হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

۵ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

শিক্ষা

এ সূরায় কুরআন মাজীদ নাযিলের কথা এবং যে রাতে কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে সে রাতের মাহাত্ম্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন, তিনি কুরআন শবে কাদরে নাযিল করেছেন। আর শবে কাদরের মর্যাদা এক হাজার মাসের চেয়ে বেশি। এ রাতে জিবরাঈল (আ) অন্য ফেরেশতাগণসহ আল্লাহর অনুমতি ক্রমে দুনিয়াতে অবতরণ করেন। আর ঐ রাতে ফজরের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে।

এ সূরা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়

- কুরআন আল্লাহর কালাম। শবে কাদরে তিনি এটি নাযিল করেছেন এবং শবে কাদরে কুরআন নাযিল করার অর্থ, এ রাতে সম্পূর্ণ কুরআন এক সাথে নাযিল হয়েছে। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, শবে কাদরে সম্পূর্ণ কুরআন প্রথম আসমানের 'বায়তুল ইয্যাহ' নামক স্থানে নাযিল করা হয়েছিল। এরপর আল্লাহর নির্দেশে ২৩ বছরে সময়ের প্রয়োজন অনুসারে পর্যায়ক্রমে তা নবী কারীম (স)-এর প্রতি নাযিল হয়।
- কুরআন নাযিলের রাত অর্থাৎ লাইলাতুল কাদর বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ রাত। এ রাতে প্রত্যেকটি বিষয়ে অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ফায়সালা জারি করা হয়। শবে কাদর কোনটি এ সম্পর্কে হাদীসের ইজ্জিত এই যে, রমযান মাসের শেষ দশকের কোন এক বেজোড় রাতই হল শবে কাদর। আবার বিশেষজ্ঞ আলিমগণের অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন যে, এ রাতটি হল রমযান মাসের ২৭তম রাত।
- লাইলাতুল কাদরের ইবাদাত এক হাজার মাসের ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি কাদরের রাতে ঈমান সহকারে এবং আল্লাহর নিকট থেকে সুফল লাভের আশায় ইবাদাতের জন্য দণ্ডায়মান থাকবেন তাঁর পেছনের সব গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।

৪. লাইলাতুল কাদরে কুরআন মাজীদ নাযিলের কারণেই তা এত মাহাত্ম্যের অধিকারী হয়েছে। এসবে বোঝা যায় মূল মর্যাদা ও মাহাত্ম্য কুরআন মাজীদের। কাজেই যে ব্যক্তি, যে সমাজ ও যে জাতি নিজেদের মধ্যে কুরআন মাজীদকে ধারণ করবে, এর অনুশাসন মেনে চলবে, সে ব্যক্তি সে সমাজ ও সে জাতি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবে।

সূরা যিল্‌যাল্ (سُورَةُ الزَّلْزَالِ)

(মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা-৮)

শানে নুযূল

এ সূরায় কিয়ামতের পূর্বে অনুষ্ঠিতব্য কঠিন ভূকম্পন এবং হাশরের মাঠে হিসাব-নিকাশের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। পৃথিবী ধ্বংসের পূর্বে বার বার ভূকম্পন হবে এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরস্থ বিশালাকার স্বর্ণখণ্ড, রৌপ্য এবং খনিজ পদার্থসমূহ উদগিরণ করবে। এ অবস্থা দেখে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়বে এবং পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে, পৃথিবীর কি হয়েছে? তখন তার অভ্যন্তরের যাবতীয় সম্পদ বের হয়ে আসবে?

এ ক্ষণস্থায়ী জগতের ধন-দৌলত এবং অর্থ-সম্পদের লোভ লালসা ত্যাগ করে ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করার উদ্দেশ্যে এ সূরাটি নাযিল হয়।

শব্দার্থ

إِذَا	- যখন।	أَوْحَى	- প্রত্যাদেশ দিয়েছে।
زُلْزِلَتْ	- প্রকম্পিত হবে।	يَصْدُرُ	- প্রকাশ পাবে।
الْأَرْضُ	- পৃথিবী।	أَشْنَانًا	- দলে দলে, পৃথকভাবে।
أَخْرَجَتْ	- বের করে দেবে, উদগিরণ করবে।	أَعْمَالُهُمْ	- তাদের কর্মকাণ্ড।
أَثْقَالَ	- ভারী বোঝা।	مَنْ	- যে ব্যক্তি।
هَا	- তার।	يَعْمَلُ	- কাজ করবে।
قَالَ	- বলবে।	مِثْقَالَ	- পরিমাণ।
مَا لَهَا	- তার কি হয়েছে।	ذَرَّةً	- অণু, পিপিলিকা থেকেও ক্ষুদ্র।
يَوْمَئِذٍ	- সেদিন।	خَيْرٌ	- ভাল।
تُحَدِّثُ	- কথা বলবে।	شَرٌّ	- মন্দ, পাপ।
أَخْبَارُ	- সংবাদসমূহ।	يَرَهُ	- তা প্রত্যক্ষ করবে।

অনুবাদ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

১. যখন পৃথিবী আপন কম্পনে ভীষণভাবে প্রকম্পিত হবে ۞ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞
২. এবং পৃথিবী তার বোঝাসমূহ বের করে দেবে। ۞ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۞
৩. এবং মানুষ বলে উঠবে এর (পৃথিবীর) কী হয়েছে? ۞ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۞
৪. সেদিন পৃথিবী আপন বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। ۞ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۞
৫. কারণ আপনার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন। ۞ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۞
৬. সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে ۞ يَوْمَئِذٍ يُصْدَرُ النَّاسُ شَتَاتًا لِّیُرَوْا ۞
তাদের কৃতকর্ম দেখান যায়। ۞ اَعْمَالَهُمْ ۞
৭. অনন্তর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে তা সে দেখতে পাবে। ۞ فَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَّرَهُ ۞
৮. এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করবে তাও সে দেখতে পাবে। ۞ وَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَّرَهُ ۞

শিক্ষা

পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। এখানে মানুষের অবস্থানও স্বল্প দিনের জন্য। কিন্তু পৃথিবীর এ ক্ষণকালীন জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। জীবনের ছোটবড় প্রতিটি কাজ রেকর্ড হয়ে থাকে। এ পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পর আবার এক বার হযরত ঈসরাফিল (আ) সিজায় ফুঁক দিবেন, তখন সকল মানুষ নিজ নিজ কবর থেকে জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ ছোটবড় সকল কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পাবে।

এ সূরা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়

১. জীবনের কাজকর্ম, কথাবার্তা, গতিবিধি সব কিছু শরীআত মোতাবেক হওয়া উচিত।
২. দৈহিকবল, জনবল, অর্থবল কোন কিছুই আখিরাতে উপকারে আসবে না। যে অর্থ-সম্পদ পাপ-পঙ্কিলতার মূল কারণ, তা পরকালে নিরর্থক হবে।
৩. হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব আমলনামা প্রত্যক্ষ করবে।
৪. ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নেক কাজকে ক্ষুদ্র মনে করে পরিহার করা উচিত নয়। কারণ এ ধরনের অসংখ্য নেক কাজ একত্রিত হয়ে আল্লাহর কাছে অতি বড় নেক কাজ বলে গণ্য হবে।
৫. কোন ছোট গুনাহকে তুচ্ছ মনে করে তাতে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ ছোট গুনাহই মানুষকে বড় গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে নবী কারীম (স) হযরত আয়িশা (রা) কে বলেন- “হে আয়িশা- যেসব গুনাহ ছোট মনে করে করা হয় তা থেকে দূরে থাক। কেননা, আল্লাহর নিকট এগুলোর জিজ্ঞাসাবাদ হবে।” (মুসনাদ আহমাদ)

(الْحَدِيثُ) হাদীস-আল্

পরিচয়

হাদীস অর্থ কথা বা বাণী। শরীআতের পরিভাষায় মহানবী (স)-এর বাণী, কর্ম ও তাঁর মৌন সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। অনুরূপভাবে সাহাবীগণের কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতি এবং তাবিঈগণের কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। হাদীস ইসলামী শরীআতের দ্বিতীয় উৎস। উপরিউক্ত সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে হাদীসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :-

(ক) কাওলী (খ) ফি'লী (গ) তাকরীরী

কাওলী হাদীস (قَوْلِي) : মহানবী (স)-এর মুখ নিঃসৃত প্রতিটি বাণীকে কাওলী হাদীস বা বাণীসূচক হাদীস বলে।

ফি'লী হাদীস (فِعْلِي) : মহানবী (স) নিজে রাসূল হিসেবে যে সকল কর্ম সম্পাদন করেছেন তাকে ফি'লী বা কর্মসূচক হাদীস বলে।

তাকরীরী হাদীস (تَقْرِيرِي) : সাহাবীগণ মহানবী (স)-এর সম্মুখে শরীআত সম্পর্কিত কোন কথা বলেছেন বা কোন কাজ করেছেন আর রাসূলুল্লাহ (স) তার প্রতিবাদ করেন নি বা নীরব থেকে এর প্রতি মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন তাকে তাকরীরী বা সম্মতিসূচক হাদীস বলা হয়।

সনদ বা রাবী পরম্পরার দিক থেকে হাদীসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : -

(ক) মারফূ' (খ) মাওকূফ (গ) মাকতূ'

মারফূ' (مَرْفُوع) : যেসব হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফূ' হাদীস বলা হয়।

মাওকূফ (مَوْقُوف) : যেসব হাদীসের বর্ণনাসূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাওকূফ হাদীস বলা হয়।

মাকতূ' (مَقْطُوع) : যে সনদসূত্রে কোন তাবিঈর কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাকতূ' হাদীস বলা হয়। আর এক প্রকার হাদীস রয়েছে যাকে হাদীস-এ কুদসী বলা হয়। যে হাদীসের মূলকথা আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং নবী কারীম (স) নিজের ভাষায় তা উম্মাতকে জানিয়ে দিয়েছেন সেটাই হাদীস-এ কুদসী।

সনদ (سَنَد) : হাদীসের বর্ণনা পরম্পরাকে বলা হয় সনদ। যে সকল ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের বলা হয় রাবী।

মাতান (مَتْن) : হাদীসের মূল বক্তব্যকে বলা হয় মাতান।

হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় প্রথম দিকে সাধারণত হাদীস লেখা নিষেধ ছিল। কারণ, তখন যদি হাদীস লিখে রাখা হত তাতে কুরআনের সঙ্গে হাদীসের সংমিশ্রণের আশঙ্কা থাকত। আরবের লোকেরা ছিল প্রখর স্মৃতির অধিকারী। নবী কারীম (স) তাঁদের হাদীস মুখস্থ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন- “ঐ ব্যক্তি ধন্য হবে যে আমার হাদীস শোনবে, সংরক্ষণ করবে এবং যেভাবে শুনছে সেভাবেই অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে।” সাহাবীগণ মহানবী (স) -এর হাদীস মুখস্থ করেন এবং তা অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। খুলাফায়ে রাশিদীন এবং বনী উমাইয়া শাসন আমলে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এভাবেই রাসূলের হাদীস মুখস্থ করে সংরক্ষণ করা হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চিঠিপত্র, চুক্তিপত্র, সনদ ইত্যাদি লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিল। তাছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশকিছু সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর বহু হাদীস লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা)-এর পাঁচশত হাদীস সম্বলিত সহীফা

আস সাদিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিজরী ১০০ সালের প্রারম্ভে প্রখ্যাত উমাইয়া খলীফা উমার ইব্ন আব্দুল আযীয (র) সরকারি পর্যায়ে হাদীস লিখার হুকুম জারী করেন। ইমাম মালিক (র)-এর সংকলিত ‘মুআত্যা’ প্রথম বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। হিজরী তৃতীয় শতক হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ সময় ৬টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। এগুলোকে একত্রে ‘সিহাহ্ সিভাহ্’ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ নামে অভিহিত করা হয়। এ সকল হাদীসের কিতাব এবং সংকলকগণের নাম এরূপ :

১. সহীহ্ বুখারী - ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র)
২. সহীহ্ মুসলিম - ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র)
৩. সুনানে নাসাই - আবদুর রহমান ইব্ন শূআইব (র)
৪. সুনানে আবু দাউদ - ইমাম আবু দাউদ ও সুলাইমান ইব্ন আশআস (র)
৫. জামি’তিরমিযী - ইমাম ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা তিরমিযী (র)
৬. সুনানে ইব্ন মাজাহ - ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াজিদ ইব্ন মাজাহ (র)।

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ইসলামী শরীআতের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। এতে শরীআতের আহকাম, মূলনীতি ও নির্দেশাবলী অতি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। আর এ সংক্ষিপ্ত নির্দেশগুলোকে কার্যকরী করার জন্য মহানবী (স) প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতেন। তাঁর এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই হচ্ছে হাদীস। যেমন কুরআন মাজীদে সালাত কয়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু দিন রাতে কয় ওয়াক্ত সালাত পড়তে হবে, প্রতি ওয়াক্তে কত রাকআত আদায় করতে হবে এবং প্রতি রাকআত কিভাবে পড়তে হবে এর বিস্তারিত বর্ণনা কুরআন মাজীদে নেই। অনুরূপভাবে কুরআন পাকে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কত পরিমাণ দিতে হবে, তার কোন উল্লেখ কুরআন মাজীদে নেই। আল্লাহর হুকুম অনুসারে মহানবী (স) এগুলোর যেসব নিয়ম-কানুন বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে হাদীস। এ কারণে কুরআনের ন্যায় হাদীসের গুরুত্বও অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন-

مَا تَأْتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ (ق) وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا (ج)

অর্থ : “রাসূল তোমাদের যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।” (সূরা হাশর : ৭)

মহানবী (স) নিজে তাঁর হাদীসের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন-

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَخِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

অর্থ : “আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা যত দিন এ দুইটি আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না, একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং অপরটি হচ্ছে তাঁর রাসূলের সুনাহ।” (মিশকাত)

কুরআনের প্রতিটি আয়াত ও নির্দেশ যেমন মানুষকে সৎপথের সন্ধান দেয়, তেমনি রাসূলের হাদীসও সমগ্র মানব জাতিকে ন্যায়, সত্য ও শান্তির পথে পরিচালিত করে। কুরআন যেমন চিরন্তন সত্য, হাদীসও তেমনি শাশ্বত। কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে-

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (ع) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

অর্থ : “আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলকে মেনে চল; যদি তা না কর তবে জেনে রেখ, আল্লাহ কাফেরদের পছন্দ করেন না।” (সূরা আলে ইমরান : ৩২)

বিদায় হাজ্জের ভাষণে মহানবী (স) মুসলিম উম্মাহর প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেন- “যারা এখানে উপস্থিত, তাদের কর্তব্য হচ্ছে, অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া” (বুখারী)।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, মানবজাতির জীবনে মহানবীর হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মহানবী (স)-এর ১০টি হাদীস এক নং হাদীস

শব্দার্থ

إِنَّمَا - নিশ্চয়ই। أَلَا عَمَلٌ - কর্মসমূহ। النَّيَّاتُ - নিয়্যাত, সংকল্প।

১- إِنَّمَا أَلَا عَمَلٌ بِالنِّيَّاتِ

অর্থ : “প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ (-এর ফলাফল) নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল।” (বুখারী)

শিক্ষা

মানুষের প্রত্যেকটি কাজের পেছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। বিনা উদ্দেশ্যে কেউ কোন কাজ করে না। কাজের উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত এ হাদীস থেকে সে শিক্ষা লাভ করা যায়। কাজের সফলতা নিয়্যাতের ওপর নির্ভর করে। নিয়্যাত সৎ হলে কাজে সফল পাওয়া যায়। নিয়্যাত ভাল না হলে কাজের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করা যায় না। যেমন উপরে বর্ণিত হাদীসটির পরবর্তী অংশেই বর্ণিত আছে- কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে তবে সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভ করবে। আর কোন ব্যক্তি যদি পার্থিব সম্পদ লাভ বা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে তবে সে তাই লাভ করবে। যেমন, উম্মে কায়িস নামক এক জন স্ত্রীলোক ইসলাম কবুল করে মদীনায় হিজরত করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নিয়্যাতে মদীনায় হিজরত করেন। এ খবর শোনার পর মহানবী (স) তাঁর এ মূল্যবান হাদীসটি বর্ণনা করেন।

কোন ভাল কাজের নিয়্যাত করলেই তাতে একটি সওয়াব লাভ করা যায়। নিয়্যাতের এ গুরুত্বের কারণেই মুমিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত আর কাফির ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের ফায়সালা করা হয়।

দুই নং হাদীস

শব্দার্থ

بُنِيَ - প্রতিষ্ঠিত।

إِقَامٌ - প্রতিষ্ঠিতকরণ।

عَلَى - উপরে।

أَنْ - যে।

شَهَادَةٌ - সাক্ষ্য।

لَا إِلَهَ - ইলাহ নেই।

إِلَّا - ব্যতীত।

أَنْ - নিশ্চয়ই।

عَبْدٌ - বান্দা।

عَبْدُهُ - তাঁর দাস, বান্দা।

إِلَّا سَلَامٌ - ইসলাম।

خَمْسٌ - পাঁচটি।

إِيتَاءٌ - প্রদান করা, আদায় করা।

২. بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ

الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ -

অর্থ : “ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল এবং সালাত কায়ম করা, যাকাত দেওয়া, হাজ্জ করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা।” (বুখারী ও মুসলিম)

শিক্ষা

এ হাদীসে মহানবী (স) ইসলামের মূল বুনয়াদগুলো উল্লেখ করেছেন। এ পাঁচটি বস্তুর সময় না ঘটলে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে না। এ পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি ঈমান অন্যতম। হাদীসে ইসলামকে পাঁচটি খুঁটি দ্বারা নির্মিত একটি তাম্বুর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। তাম্বুর মধ্যস্থিত খুঁটিটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর এটিই হচ্ছে আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি ঈমান। তাম্বুর অন্য স্তম্ভগুলোও অত্যাৱশ্যক।

সবগুলো স্তম্ভ বর্তমান থাকলে একটি তাম্বু বহাল থাকে। একটির অভাবে অন্যটি ভুলুষ্ঠিত হয়। আর মধ্যস্থিত খুঁটির অভাবে পুরো তাম্বুটিই ভেঙে পড়ে। কাজেই পূর্ণ মুসলিম হতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এ পাঁচটি ভিত্তির সময়য় প্রয়োজন।

এ হাদীসে সালাত ও সাওমের উল্লেখ করে দৈহিক সকল প্রকার ইবাদাতের প্রতি ইজ্জিত করা হয়েছে। আর সালাত এমন একটি ইবাদাত যা মানুষকে সকল প্রকার অশ্লীল ও অন্যায কাজ থেকে বিরত রাখে। সালাত দ্বীনের খুঁটি। সাওম এমন একটি দৈহিক ইবাদাত যা একমাত্র আল্লাহ তাআলার আনুগত্য প্রকাশের জন্যই হয়ে থাকে, এতে রিয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যাকাতের উল্লেখ দ্বারা এখানে এমন সব ধরনের ইবাদাতকে বোঝান হয়েছে যা মানুষ অর্থ সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর হুকুম পালন করে এবং এর দ্বারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং হাজ্জের দ্বারা এমন ইবাদাতের উল্লেখ করা হয়েছে যা শারীরিক ও আর্থিক সক্ষমতার মাধ্যমে সম্ভব হয়। কাজেই আমাদের মুখ, দেহ এবং অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সকল প্রকার কৃতজ্ঞতা আদায় করা অত্যাৱশ্যক।

তিন নং হাদীস

শব্দার্থ

خِيَارٌ - উত্তম, উৎকৃষ্ট। تَعَلَّمَ - শিখেছে। كُمْ - তোমাদের (সর্বনাম)।

عَلَّمَ - শিক্ষা দিয়েছে। مَنْ - যে ব্যক্তি।

৩. خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (ابن ماجه)

অর্থ : “তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট, যে নিজে কুরআন শিখেছে এবং তা অপরকে শিক্ষা দিয়েছে।” (ইবন মাজাহ)

শিক্ষা

কুরআন মাজীদ মহান আল্লাহর কালাম। এটি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিদায়াতের উৎস। এটি মানবজাতির সঠিক পথ প্রদর্শক এবং মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের ধারক ও বাহক। কুরআন পাকের এ অমূল্য সম্পদরাজি আহরণের জন্য তা শিখতে হবে এবং জানতে হবে। এ হাদীসে কুরআনের শিক্ষার্থীকে অন্যসব শিক্ষার্থীর তুলনায়

অধিক মর্যাদার অধিকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, তিনি এমন একটি গ্রন্থের জ্ঞান লাভে ব্রতী হয়েছেন, যাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এ গ্রন্থ তাঁর চরিত্র উন্নত করবে, লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বेष এবং পাশবিক আচরণ থেকে মুক্ত করবে। গরিব, দুঃখী ও সহায় সম্বলহারাাদের প্রতি তাঁকে দরদী করে তোলাবে। সমাজের অন্যায় অত্যাচার দূর করার সংগ্রামে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করবে। অনুরূপভাবে যিনি কুরআনের শিক্ষা দানে নিজেকে নিয়োজিত করেন, তিনি সমাজের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কুরআনের শিক্ষা অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত একটি জাতিকে সমুন্নত করেছে, জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে তুলে এনে তাঁদের জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত করেছে। তাঁরা এক সময় জগতের শিক্ষাগুরুর আসন লাভ করেছিলেন। কুরআনের জ্ঞানেই এক দিন ইউরোপের অন্ধকার বিদূরিত হয়েছে। মুসলিম সমাজ কুরআন মাজীদেবের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে নিজেদের জীবনে তার শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করলে আজও তাঁরা বিশ্ব সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবেন। কাজেই আমরা কুরআন শিখব এবং তা শিক্ষা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকব।

চার নং হাদীস

শব্দার্থ

أَيَّاهُ - চিহ্ন।	حَدَّثَ - কথা বলে।	أَخْلَفَ - ভঙ্গা করে।
مُنَافِقٌ - কপট।	كَذَبَ - মিথ্যা বলে।	أَوْثُونَ - গচ্ছিত রাখা হলে।
ثَلَاثَ - তিন।	وَعَدَ - প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।	خَانَ - খিয়ানত করে।

৪ - آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ -

অর্থ : “মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি, সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তখন তা ভঙ্গা করে, আর যখন তার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখা হয় তখন সে খিয়ানত করে।” (বুখারী ও মুসলিম)

শিক্ষা

এ হাদীসে মুনাফিকের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তার চরিত্রে তিনটি মারাত্মক দোষ পরিলক্ষিত হয়।

১. কথা বললেই মিথ্যা বলে, ২. ওয়াদা করলে ভঙ্গা করে এবং ৩. তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে তা খিয়ানত করে। এ তিনটি কাজ অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিন্দনীয়। যেমন, মিথ্যা সকল পাপের মূল। মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে। মিথ্যাবাদী লোক সমাজে ঘৃণার পাত্র।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গা করা মারাত্মক দোষ। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গাকারী কোন কাজে সফলতা অর্জন করতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ইত্যাদি মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। নবী কারীম (স) একটি হাদীসে বলেছেন, “যে ব্যক্তি ওয়াদা রক্ষা করে না, তার দ্বীনদারী নেই।”

আমানতের খিয়ানত একটি অতি গর্হিত কাজ। এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তির প্রতি কারও শ্রদ্ধাবোধ থাকে না। নবী কারীম (স) বলেছেন, “যে আমানত রক্ষা করে না, তার (পূর্ণ) ঈমান নেই।”

উল্লেখিত তিনটি স্বভাব দ্বারা কপট ব্যক্তির কথা, কাজ ও নিয়্যাতের প্রতি ইজ্জিত করা হয়েছে। কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি এ তিনটি স্বভাবের সমন্বয় ঘটে তবে সে মুনাফিক হয়ে যায়। তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। কাজেই আমরা সর্বদা মুনাফেকী থেকে বেঁচে থাকব।

পাঁচ নং হাদীস

শব্দার্থ

يَغْرِسُ - গাছ রোপণ করে। طَيْرٌ - পাখি। بِهِيْمَةٌ - চতুষ্পদ জন্তু।
يَزْرَعُ - চাষ করে, আবাদ করে। إِنْسَانٌ - মানুষ। صَدَقَةٌ - সাদকা, দান।
يَأْكُلُ - ভক্ষণ করে।

৫- مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَاكَلَ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ
أَوْ بِهِيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (متفق عليه)

অর্থ : “কোন মুসলমান যদি গাছ রোপণ করে অথবা কোন ফসল আবাদ করে এবং তা থেকে কোন পাখি বা মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সাদকারূপে পরিগণিত হবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

শিক্ষা

মহানবী (স)-এর এ হাদীস মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী হাদীস। এ হাদীসে মহানবী (স) আমাদেরকে বৃক্ষরোপণ এবং কৃষি কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। কেননা এ দুইটি মানুষের প্রয়োজনীয় শ্রেষ্ঠ সামগ্রী। খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় মানুষের প্রধান প্রয়োজন। এগুলোর সব কিছুর জন্যই মানুষ কোন না কোন ভাবে বৃক্ষ ও ক্ষেতখামারের আবাদের ওপর নির্ভর করে।

এ হাদীস আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, গাছ লাগানো একটি পবিত্র কাজ, নেকীর কাজ। এতে লজ্জার কিছুই নেই। অনুরূপভাবে আবাদ বা ফসল উৎপাদন করা পুণ্যের কাজ। এতে যে কেউ উপকৃত হোক তাতে শ্রমিকের শ্রম বৃথা যায় না। বরং সে এর বিনিময়ে সওয়াবের অধিকারী হয়। আমরা অধিক পরিমাণে গাছ লাগাব, তার যত্ন নেব, ক্ষেতে-খামারে অধিক পরিমাণে ফসল ফলানোর চেষ্টা করব।

ছয় নং হাদীস

শব্দার্থ

الْخَلْقُ - মাখলুক, সমগ্র সৃষ্টি। أَحَبُّ - সর্বাধিক প্রিয়। أَحْسَنَ - অনুগ্রহ করলেন।
عِيَالٌ - পরিজন, আপন জন। مَنْ - যে। إِلَى - প্রতি।

৬- الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ -

অর্থ : “সকল সৃষ্টিই আল্লাহর আপন জন। অতএব, তিনিই আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় যিনি তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করেন।”

শিক্ষা

গোটা সৃষ্টি জগৎ আল্লাহ তাআলার পরিজনস্বরূপ। তিনি সকলকেই লালন-পালন করেন, তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেন। সৃষ্টিকুলের সকলকে তিনি সমকক্ষতার অধিকারী করেননি। এটা তাঁর পরীক্ষা। তাঁর পরিজনদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই তাঁর নিকট অধিক প্রিয় যে তাঁর মাখলূকের প্রতি অনুগ্রহ করে। মানবজাতি, জীবজন্তু ও পশুপাখি সবই আল্লাহর মাখলূক। এ হাদীসে আল্লাহর এসব মাখলূকের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া করে আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন।

মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব তথা আশরাফুল মাখলূকাত। এ কারণে অন্যান্য জীবের প্রতিও তাদের অনুগ্রহশীল হতে হবে। জীবের প্রতি দয়া একটি মহৎগুণও বটে। অতএব, এ বিশ্ব জগতের সকল কিছুর প্রতিই আমাদের অনুগ্রহ করতে হবে।

সাত নং হাদীস

শব্দার্থ

أَنْصُرُ - সাহায্য করা।	مَظْلُومٌ - অত্যাচারিত।	فَرَدُّهُ - তাকে বিরত রাখ।
آخَاكَ - তোমার ভাই।	إِنْ - যদি।	فَأَنْصُرْهُ - তাকে সাহায্য কর।
ظَالِمٌ - অত্যাচারী।	يَكُ - সে হয়।	

৭. أَنْصُرْ آخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ يَكُ ظَالِمًا فَأَرُدُّهُ مِنْ ظُلْمِهِ وَإِنْ يَكُ مَظْلُومًا فَأَنْصُرْهُ (দারমী)

অর্থ : “তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক। সে যদি অত্যাচারী হয় তবে তুমি তাকে যুলুম করা থেকে বিরত রাখ। আর যদি সে অত্যাচারিত হয়, তবে তাকে সাহায্য কর (যালিমের কবল থেকে রক্ষা কর)।”

শিক্ষা

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয় ব্যক্তিকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যালিম এবং মাযলুম দুই জনকেই মুসলমানের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুসলমান ব্যক্তির কর্তব্য তার ভাইকে বিপদ থেকে রক্ষা করা। মাযলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তি যখন যুলুমের শিকার হয় তখন তার ভাই কখনও নির্বিকার নিশ্চুপ বসে থাকতে পারে না। তাকে এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ অবশ্যই করতে হবে। কারণ মুসলিম জাতি ন্যায়নিষ্ঠ জাতি। তাদের ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন কোন অন্যায় বা গর্হিত কাজ সমাজে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যাবে তখন শক্তি-সামর্থ্য ও বল দিয়ে ঐ অন্যায়কে প্রতিহত করা তার ঈমানী দায়িত্ব। এ জন্য প্রয়োজন হলে তাকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

যে ব্যক্তি যালিম, অন্যের ওপর অত্যাচার করে তার সম্পর্কেও আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। কারণ সে আমাদের ভাই। বরং তার চরিত্র সংশোধনও করতে হবে। নবী-রাসূল ও মহাপুরুষগণ এভাবেই সমাজ থেকে অত্যাচারের মূলোৎপাটন করেছেন এবং অত্যাচারী ব্যক্তিকে ভাল মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। কাজেই আমরা আমাদের সমাজে অত্যাচারী, সন্ত্রাসী এবং খারাপ লোককে ভাল করার জন্য চেষ্টা করব এবং মাযলুম ব্যক্তির সহায়তায় এগিয়ে আসব।

প্রতারণার যুগে ন্যায়নীতি সহকারে ব্যবসা করা জিহাদের সমতুল্য। কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা উত্তম জিহাদ। সুদি কারবার এবং সুদি লেনদেনের পরিবেশে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমানতদারী ও সততার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা বড় কঠিন কাজ। এক জন মুসলিম ব্যবসায়ীই এ প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারেন। আর আল্লাহ তাআলা তখন তাঁকে এর বিনিময়ে আখিরাতে দান করবেন শাহাদাতের দুঃপ্রাপ্য মর্যাদা।

কাজেই আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা রক্ষা করে চলব।

দশ নং হাদীস

শব্দার্থ-

كَلِمَتَانِ - দুইটি বাক্য। لِسَانُ - জিহ্বা, মুখ। حَبِيبَةٌ - প্রিয়।
خَفِيفَتَانِ - সহজ। ثَقِيلَةٌ - কঠিন, ভারি। رَحْمَنُ - পরম দয়ালু।

১০. كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ
سُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (بخاری)

অর্থ : এমন দুইটি বাক্য আছে যা কবুণাময় আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়, উচ্চারণ করতে খুবই সহজ এবং দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপে খুবই ভারি। বাক্য দুইটি হল, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’ ‘সুবহানাল্লাহিল আযীম’। “মহাপবিত্র আল্লাহ, তাঁর জন্য সকল প্রশংসা। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহামহিম।” (বুখারী)

শিক্ষা

এ হাদীসে এমন দুইটি কালিমার উল্লেখ আছে যার যিক্র আল্লাহ তাআলার নিকট অতি প্রিয়, বান্দার জন্য এর পাঠ সহজ এবং এতে অনেক বেশি নেকী অর্জন করা যায়।

আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত, তাঁর কোন অভাব নেই। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। এ বিশাল পৃথিবী তাঁর সৃষ্টি। এ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই। এ বিশাল আসমান জমিনের প্রতি ভাকালে তখন আমাদের অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয়ে আসে ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’। আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য।

তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। তাঁর অসীম দয়া ও কবুণা আমাদের বেঁচন করে আছে। এ পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর প্রশংসায় নিয়োজিত, তিনি মহান। মনের এ উপলব্ধির সাথে সাথে আমাদের মুখে উচ্চারণ করতে হবে ‘সুবহানাল্লাহিল আযীম’- মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহামহিম। কাজেই এ দুইটি পবিত্র কালিমার মাধ্যমে আমরা সর্বদা আল্লাহর যিক্র করব এবং আমাদের পরকালের নেকীর পাল্লা ভারি করব।

ইজ্মা (إِجْمَاعٌ)

ইজ্মা ইসলামী শরীআতের তৃতীয় উৎস। কুরআন এবং সুন্নাহর পরেই এর স্থান। ‘ইজ্মা’ এর আভিধানিক অর্থ ঐকমত্য। ইসলামের পরিভাষায়, একই যুগের মুসলিম উম্মাহর পুণ্যবান মুজতাহিদগণের (গবেষক) শরীআতের কোন

প্রতারণার যুগে ন্যায়নীতি সহকারে ব্যবসা করা জিহাদের সমতুল্য। কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা উত্তম জিহাদ। সুদি কারবার এবং সুদি লেনদেনের পরিবেশে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমানতদারী ও সততার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা বড় কঠিন কাজ। এক জন মুসলিম ব্যবসায়ীই এ প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারেন। আর আল্লাহ তাআলা তখন তাঁকে এর বিনিময়ে আখিরাতে দান করবেন শাহাদাতের দুঃপ্রাপ্য মর্যাদা।

কাজেই আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা রক্ষা করে চলব।

দশ নং হাদীস

শব্দার্থ-

كَلِمَتَانِ - দুইটি বাক্য। لِسَانُ - জিহ্বা, মুখ। حَبِيبَةٌ - প্রিয়।
خَفِيفَتَانِ - সহজ। ثَقِيلَةٌ - কঠিন, ভারি। رَحْمَنُ - পরম দয়ালু।

১০. كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ
سُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (بخاری)

অর্থ : এমন দুইটি বাক্য আছে যা কবুণাময় আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়, উচ্চারণ করতে খুবই সহজ এবং দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপে খুবই ভারি। বাক্য দুইটি হল, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’ ‘সুবহানাল্লাহিল আযীম’। “মহাপবিত্র আল্লাহ, তাঁর জন্য সকল প্রশংসা। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহামহিম।” (বুখারী)

শিক্ষা

এ হাদীসে এমন দুইটি কালিমার উল্লেখ আছে যার যিক্র আল্লাহ তাআলার নিকট অতি প্রিয়, বান্দার জন্য এর পাঠ সহজ এবং এতে অনেক বেশি নেকী অর্জন করা যায়।

আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত, তাঁর কোন অভাব নেই। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। এ বিশাল পৃথিবী তাঁর সৃষ্টি। এ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই। এ বিশাল আসমান জমিনের প্রতি ভাকালে তখন আমাদের অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয়ে আসে ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’। আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য।

তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। তাঁর অসীম দয়া ও কবুণা আমাদের বেঁচন করে আছে। এ পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর প্রশংসায় নিয়োজিত, তিনি মহান। মনের এ উপলব্ধির সাথে সাথে আমাদের মুখে উচ্চারণ করতে হবে ‘সুবহানাল্লাহিল আযীম’- মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহামহিম। কাজেই এ দুইটি পবিত্র কালিমার মাধ্যমে আমরা সর্বদা আল্লাহর যিক্র করব এবং আমাদের পরকালের নেকীর পাল্লা ভারি করব।

ইজ্মা (إِجْمَاعٌ)

ইজ্মা ইসলামী শরীআতের তৃতীয় উৎস। কুরআন এবং সুন্নাহর পরেই এর স্থান। ‘ইজ্মা’ এর আভিধানিক অর্থ ঐকমত্য। ইসলামের পরিভাষায়, একই যুগের মুসলিম উম্মাহর পুণ্যবান মুজতাহিদগণের (গবেষক) শরীআতের কোন

বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজ্‌মা বলা হয়। ইজ্‌মা যে শরীআতের একটি দলিল ও উৎস এ সম্পর্কে নবী কারীম (স) বলেছেন “মুসলিমগণ যা ভাল মনে করে, তা আল্লাহর নিকটও ভাল।” তিনি আরও বলেছেন, “আমার উম্মাতগণ কোন ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হবে না।” মহানবী (স)-এর ইন্তিকালের পরই অনেক বিষয় সাহাবীগণের ঐকমত্য বা ইজ্‌মা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন আয়াতে ইজ্‌মার প্রতি ইজ্জিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ .

অর্থ : “আর তেমনি আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষ্যদানকারী হতে পার।” (সূরা আল-বাকারাহ : ১৪৩)

এখানে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে মধ্যমপন্থী তথা ন্যায়পরায়ণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের ইজ্‌মা একটি দলিল।

ইজ্‌মার উৎপত্তি

মুসলিম সমাজ কখনও নিশ্চল, নিথর ও গতিহীন ছিল না, সর্বদাই এ সমাজ গতিশীল। মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় যখন এমন সমস্যার উদ্ভব ঘটত যার সমাধান পবিত্র কুরআনে সরাসরি পাওয়া যায় না। তখন তিনি বিশিষ্ট সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে তার সমাধান করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে যদি এমন কোন সমস্যা দেখা দিত যার সমাধান কুরআন এবং সুন্নাতে পাওয়া যেত না, তখন তাঁরা প্রধান প্রধান সাহাবীর মতামত নিয়ে তাঁর সমাধান করতেন। হযরত উমার (রা)-এর যুগে অনেক বিষয়ে সাহাবীগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ সাহাবীগণের ইজ্‌মা দ্বারা রমযান মাসের রাতে বিশ রাকাআত তারাবীর নামায জামাআতের সাথে আদায় করার রীতি হযরত উমার ফারুক (রা)-এর আমলে প্রচলিত হয়। তাবিঈগণের যুগেও এ পন্থতিতেই নতুন সমস্যার সমাধান করা হত।

ইজ্‌মার হুকুম

শরীআত সংক্রান্ত বিষয়ে ইজ্‌মা একটি অকাট্য দলিল। কোনক্রমেই ইজ্‌মার বিরোধিতা করা যায় না।

কিয়াস (قِيَاسُ)

পরিচয়

জগৎ পরিবর্তনশীল। জগতের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জন্ম হয়, নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন জটিলতার উদ্ভব ঘটে। ইসলাম এসব পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে এবং যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দিতে সক্ষম। কারণ ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা। এ ছাড়াও ইসলামী শরীআতের বিধানদাতা হচ্ছেন, এ জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা। তিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্যক অবগত। ফলে, কুরআন-হাদীসে শরীআতের মূল বিষয়গুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, এগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। আর এটাই কিয়াস।

শরীআতের দলিল হিসেবে ইজ্‌মার পর কিয়াসের স্থান। কিয়াস ইসলামী কানুনের চতুর্থ উৎস। কিয়াস শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিমাণ, অনুমান ও তুলনা করা। শরীআতের পরিভাষায় পূর্ব সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে পূর্বের আইন প্রয়োগ করাকে কিয়াস বলা হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন-

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ .

অর্থ : “অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।” (সূরা হাশর : ২)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কোন বস্তুকে তার সমপর্যায়ের বস্তুর সাথে কিয়াস বা পরিমাপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যে ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজ্‌মায় সরাসরি সমাধান পাওয়া যায় না, সে ক্ষেত্রেই কিয়াস প্রযোজ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যখন রাসূলুল্লাহ (স) মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে কাযী হিসেবে ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, “যখন কোন সমস্যার উদ্ভব হবে তখন কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে?” তিনি উত্তর দিলেন, “আল্লাহর পবিত্র কিতাব মুতাবেক।” রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, “আল্লাহর কিতাবে যদি না পাও?” তিনি উত্তরে বলেন, “তাহলে নবীর সুন্নাহ অনুসারে।” তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, “যদি তাতে না পাও?” তিনি জবাবে বলেন, “তা হলে আমি আমার নিজের বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।” তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, “প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আল্লাহর রাসূলের দূত দ্বারা এমন উত্তর দেওয়ালেন যাতে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট হলেন।”

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর সাহাবীগণও সুন্নাহর আলোকে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করতেন। এরপর চার মাসহাবের ইমামগণ কিয়াস প্রয়োগ করে অগণিত সমস্যার সমাধান করেন। ইমামগণ নিম্নলিখিত নীতিমালার আলোকে কিয়াস প্রয়োগ করতেন :

- (ক) যে সকল বিষয়ের সমাধান কুরআন, হাদীস এবং ইজ্‌মার মাধ্যমে করা হয়েছে সে সকল বিষয়ে কিয়াস প্রযোজ্য নয়।
- (খ) কিয়াস কুরআন, হাদীস ও ইজ্‌মা পরিপন্থী হবে না।
- (গ) কুরআন, হাদীস ও ইজ্‌মা দ্বারা প্রবর্তিত কোন আইনের মূলনীতি বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা কিয়াসের আওতা বহির্ভূত।
- (ঘ) কিয়াসের মূলনীতি মানুষের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে থাকতে হবে।

শরীআতের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষা

সকল বিষয়ের নিজস্ব পরিভাষা থাকে। ইসলামী শরীআতেরও নিজস্ব কিছু পরিভাষা আছে। এ সকল পরিভাষার মাধ্যমে ইসলামী শরীআতের বিধানগুলোর পর্যায়ক্রমিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব।

ফরয

শরীআতের এমন কতগুলো বিধান আছে যেগুলো পালন করা অবশ্য কর্তব্য। অবজ্ঞা সহকারে সেগুলো বর্জন করলে ঈমান থাকে না। আর অলসতা করে পালন না করলে কঠিন শাস্তি পাবে এ ধরনের বিধানকে ফরয বলা হয়।

ওয়াজিব

শরীআতের এমন কিছু বিধান আছে যেগুলো পালন করা কর্তব্য। এগুলো লঙ্ঘন করলে শাস্তির বিধান আছে। এ ধরনের বিধানকে বলা হয় ওয়াজিব।

সুন্নাত

যে সকল কাজ মহানবী (স) নিজে করেছেন, উম্মাতকে করার জন্য তাকিদ দিয়েছেন, তা না করলে শাস্তির বিধান রয়েছে। এছাড়াও কোন কোন কাজ তিনি করেছেন কিন্তু উম্মাত তা না করলে শাস্তির বিধান প্রবর্তন করেন নি। এ উভয় প্রকার ইবাদাত নবী কারীম (স)-এর সুন্নাহ নামে খ্যাত।

মুস্তাহাব

যে সব ভাল কাজে রাসূলুল্লাহ (স) উম্মাতকে উৎসাহ প্রদান করেছেন সেগুলোই মুস্তাহাব।

এ আলোচনা থেকে আমরা শরীআতের চারটি পরিভাষা জানতে পারলাম। যথা : (ক) ফরয (খ) ওয়াজিব (গ) সুন্নাহ এবং (ঘ) মুস্তাহাব।

আমরা এখন এ পরিভাষাগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

ফরয

যে সকল কাজ কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিল দ্বারা অবশ্য পালনীয় ও অলঙ্ঘনীয় বলে প্রমাণিত তাকে ফরয বলা হয়। ফরয কাজ কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা যায় না। ফরয কাজ না করলে কবীরা গুনাহ হয় এবং তার অঙ্গীকারকারী কাফির হয়।

ফরয দুই প্রকার- (১) ফরযে আইন। (২) ফরযে কিফায়া।

যে সকল ফরয কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে দায়ী, তাকে ফরযে আইন বলা হয়। শরীআতসম্মত কোন কারণ ছাড়া ফরযে আইন ত্যাগ করা যায় না। যেমন- দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করা, রমযান মাসের সিয়াম পালন করা, যাকাত আদায় করা, সম্পদশালী সুস্থ ব্যক্তির জীবনে এক বার হাজ্জ করা ইত্যাদি। ফরযে আইন পালন না করলে কঠিন গুনাহ্গার হতে হবে।

যে কাজ পালন করা মুসলমানের ওপর ফরয কিন্তু সমাজের কতিপয় মুসলমান যদি তা সম্পন্ন করে তবে অবশিষ্ট সবাই ঐ কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়; এরূপ কাজকে ফরযে কিফায়া বলে। যেমন- জানাযার নামায, জিহাদ প্রভৃতি।

ওয়াজিব

ওয়াজিব ফরযের কাছাকাছি এবং অবশ্য পালনীয়। তা অকাট্য দলীল বা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত নয়। ওয়াজিব ফরযের কাছাকাছি বলে এটা অবশ্য পালনীয়। ওয়াজিব অঙ্গীকার করলে কাফির হবে না, তবে পালন না করলে কঠিন গুনাহ হবে। সালাতের মধ্যে যেসব ওয়াজিব কাজ রয়েছে সেগুলো ছেড়ে দিলে সিজদা সাহু দিতে হবে। নচেৎ সালাত পুনরায় পড়া ওয়াজিব। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আয্হা এবং বিতর-এর সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

সুন্নাত

মহানবী (স) এবং সাহাবীগণের নির্দেশে যে সকল কাজ মুসলমানদের কর্তব্যরূপে নির্ধারিত হয়েছে তাকে সুন্নাত বলা হয়। সুন্নাত দুই প্রকার- (১) সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ্ এবং সুন্নাতে যাদিদাহ্ বা গায়ের মুওয়াক্কাদাহ্। যে সকল ইবাদাত মহানবী (স) নিজে সর্বদাই পালন করতেন এবং অন্যকেও তা পালন করার জন্য তাকীদ দিতেন, তাকে সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ্ বলে। এটি ওয়াজিবের কাছাকাছি বলে পালন করা কর্তব্য। বিনা কারণে সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ্ ত্যাগ করলে গুনাহ হবে। যেমন- আযান ও ইকামাত দেওয়া, ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাকাআত, যুহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাআত ও পরে দুই রাকাআত, ইশা ও মাগরিবের ফরযের পরে দুই রাকাআত করে নামায আদায় করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ্।

যে সকল কাজ মহানবী (স) কখনও করতেন এবং কখনও ছেড়ে দিতেন এবং এ ব্যাপারে তাকীদ করেননি তাকে সুন্নাতে গায়ের মুওয়াক্কাদাহ্ বলে। যেমন- আসরের ও ইশার ফরযের পূর্বে চার রাকাআত নামায পড়া সুন্নাতে গায়ের মুওয়াক্কাদাহ্।

মুস্তাহাব

যে সকল কাজের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) উম্মাতকে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং তা সম্পাদন করলে নেকী পাওয়া যাবে, কিন্তু না করলে গুনাহ হবে না, তাকে মুস্তাহাব বলে। ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাতের অতিরিক্ত ইবাদাত মুস্তাহাব বলে গণ্য। মুস্তাহাবকে নফল বা মানদুব নামেও অভিহিত করা হয়।

হালাল ও হারাম

পৃথিবী মানুষের জন্য একটি পরীক্ষাগার। এখানে তার অবস্থান স্বল্প কালের জন্য। আর আখিরাত মানুষের স্থায়ী আবাসস্থল। সেখানকার জীবন চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য কিছু কিছু বস্তু হারাম করেছেন, আর কিছু কিছু বস্তু হালাল করেছেন। যেমন- পুরুষের জন্য স্র্ণ ব্যবহার করা, রেশমের তৈরি পোশাক পরিধান করা হারাম। মানুষের জন্য সামগ্রিকভাবে যা কল্যাণকর এবং উপাদেয়, শরীআত তার জন্য তা হালাল করেছে, আর যা তার জন্য ক্ষতিকর তা হারাম করেছে।

হালাল

হালাল অর্থ বৈধ বা সিন্ধ। যে সকল বিষয় বৈধ হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত তাকে বলা হয় হালাল। যে কাজে বা খাদ্য গ্রহণে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় না এবং অন্য কারও অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না তা হালাল বলে বিবেচিত। হালাল হারামের বিপরীত। হালাল যেমন গ্রহণীয়, হারাম তেমনি বর্জনীয়। যে সকল কাজ ও বস্তুর হালাল হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিল রয়েছে তাকে হালাল বায়িন বা স্পষ্ট হালাল বলা হয়। যেমন, আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশিত পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা, লেন-দেন করা, কোন হালাল প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া ইত্যাদি।

হারাম

যে সকল কাজ বা বস্তু কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশে অবশ্য পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়, তাকে হারাম বলে। হারাম কাজ জেনে শূনে করলে কঠোর গুনাহ হবে। আর হারামকে হালাল মনে করা অথবা হালালকে হারাম মনে করা কুফর। হালাল বস্তু অসংখ্য, যা তালিকাভুক্ত করা সম্ভব নয়।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন- **وَلَا تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا.**

অর্থ : “তোমরা যদি আল্লাহর নিআমত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না।” (সূরা ইবরাহীম : ৩৪)

হারাম বস্তুর সংখ্যা সীমিত। এ কারণে নিম্নে কতিপয় হারাম বস্তুর তালিকা প্রদান করা হল :

১. মৃত জীব ভক্ষণ করা হারাম। তবে মৃত মাছ খাওয়া হালাল।
২. যবাই করার পর যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা হারাম, তবে হালাল জন্তুর গোশ্‌তের মধ্যে যে রক্ত থেকে যায় তা হারাম নয়।
৩. শূকরের গোশ্‌ত খাওয়া হারাম।
৪. মানুষের গোশ্‌ত খাওয়া হারাম।
৫. যে সকল প্রাণীকে কোন দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করা হয়, তার গোশ্‌ত হারাম।
৬. হালাল জীবজন্তুকে গলা টিপে, কুপিয়ে, উঁচু থেকে ফেলে দিয়ে অথবা ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হলে তার গোশ্‌ত খাওয়া হারাম। এতে রক্ত প্রবাহিত হয় না, এটা নিষ্ঠুর আচরণ।
৭. হিংস্রপ্রাণী, যেমন- সিংহ, বাঘ, ভালুক, শিয়াল, কুকুর ইত্যাদি এবং হিংস্রপাখি যেমন- বাজ, চিল ইত্যাদির গোশ্‌ত হারাম।
৮. যে সকল প্রাণী সাধারণত নাপাক ও মরা জীবজন্তু খেয়ে বাঁচে তাও হারাম। যেমন- কাক, শকুন ইত্যাদি।
৯. যে সকল প্রাণী কষ্টদায়ক, বিষাক্ত ও ক্ষতিকর তাও হারাম। যেমন- সাপ, বিছু ইত্যাদি।
১০. গাধা, খচ্চর এবং হাতির গোশ্‌ত হারাম।
১১. যে সকল দ্রব্য মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটায় ও উন্মাদনা সৃষ্টি করে তা পান করা হারাম। যেমন- হিরোইন, মদ, আফিম ইত্যাদি সবরকম মাদকদ্রব্য।

মানব জীবনে হালাল ও হারামের প্রভাব

হালাল

আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন। আর এ বিশ্বের সবকিছুই তিনি তাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন- **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (ق)**

অর্থ : “তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন” (সূরা বাকারা : ২৯)

আল্লাহ জানেন, এ পৃথিবীর কোন্ বস্তু তাদের দেহ, মন, মস্তিষ্ক এবং আত্মার জন্য কল্যাণকর আর কোন্ বস্তু অকল্যাণকর, কোন জিনিস তাদের উপকার সাধনকারী আর কোন জিনিস ক্ষতিকারক। ফলে তিনি এমন সব বস্তু মানুষের জন্য হালাল করেছেন যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে, তাদের দেহ ও মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখে। হালাল খাদ্য অন্তরে নূর সৃষ্টি করে, অন্যায় ও অসৎ চরিত্রের প্রতি ঘৃণাবোধ জন্মায় এবং মানুষের মধ্যে সৎ গুণাবলী বৃদ্ধি করে। হালাল খাদ্য গ্রহণ করলে ইবাদাতে অধিকতর মনোযোগ আসে। তার কারণেই আল্লাহ নবীগণকে হালাল খাদ্যের প্রতি অনুপ্রাণিত করে বলেন- “হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু হতে আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত” (সূরা আল মুমিন : ৫১)

সকল মানুষকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক বলেন- **يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا (ز)**

অর্থ : “হে মানবমণ্ডলী! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর।” (সূরা বাকারা : ১৬৮)

হারাম

হারাম খাদ্য, পানীয় এবং বস্তু অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কোন কোন খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে এমন সব উপাদান থাকে যা সুস্থ মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটায়, উন্মাদনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ করে দেয়। যেমন- হিরোইন, মদ, আফিম, গাঁজা ইত্যাদি। এসব বস্তু মানুষের দেহের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে, সামাজিক পরিবেশ বিনষ্ট করে, আর্থিক দিক থেকে মানুষকে পঙ্খু ও দেউলিয়া করে দেয়। জুয়া, হাউজি, লটারি শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম। এগুলো অপবিত্র এবং শয়তানের কাজ। এতে মানুষ সর্বস্বান্ত হয়। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

অর্থ : হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। অতএব এগুলো বর্জন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” (সূরা মায়িদাহ : ৯০)

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, হিংস্র প্রাণীর দেহে এমন সব জীবাণু আছে যা মানুষের দেহের জন্য ক্ষতিকর। কাজেই তা আমাদের জন্য হালাল হতে পারে না। এছাড়া হারাম খেলে মন্দ অভ্যাস ও অসচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, ইবাদাতে আগ্রহ থাকে না এবং দুআ কবুল হয় না।

নবী কারীম (স) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “বহুলোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে বলতে থাকে, হে পরওয়ারদেগার! কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত- এমতাবস্থায় তার দুআ কি করে কবুল হতে পারে?” (মুসলিম, তিরমিযী)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

- ১। 'সালাত আদায় করার পর জমিনে ছড়িয়ে পড়।'— অনুবাদটি কোন সূরার অন্তর্গত?

ক. সূরা বনী ইসরাঈল	খ. সূরা আলে ইমরান
গ. সূরা জুমুআ	ঘ. সূরা মু'মেনুন
- ২। 'লা তানহার' শব্দের অর্থ কী?

ক. কঠোর হবেন না	খ. ধমক দেবেন না
গ. নিষেধ করবেন না	ঘ. আশ্রয় দেবেন না
- ৩। হযরত আবু বকর (রা) কুরআনকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব কার ওপর দেন?

ক. হযরত উসমান (রা)	খ. হযরত জায়িদ ইব্ন সাবিত (রা)
গ. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)	ঘ. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)
- ৪। শরীআতের উৎস হিসেবে কiyাসের অনুমোদন প্রমাণ করে যে, ইসলাম –

ক. গতিশীল	খ. সর্বজনীন
গ. নিরপেক্ষ	ঘ. সুনিয়ন্ত্রিত
- ৫। আদালতে জাহাজির তার আত্মীয়-এর পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। ইসলামী শরীআ অনুযায়ী তা-

ক. হালাল	খ. হারাম
গ. মাকরুহ	ঘ. মুস্তাহাব
- ৬। কুরআন অধ্যয়নের ফলে –
 - i. সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বোঝা যায়
 - ii. রাজনীতির হালচাল জানা যায়
 - iii. জীবনের সঠিক পথের নির্দেশ মেলে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আরিফ মাদক সেবন করে। তাকে নিষেধ করলে শোনে না। এ কারণে তাকে মারধর করা হয়। বিষয়টি ধর্মীয় শিক্ষককে বললে তিনি মাদক সেবনকে হারাম বলেন। নিবুপায় হয়ে তাকে সংশোধন কেন্দ্রে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।

৭। কিসের ভিত্তিতে ধর্মীয় শিক্ষক আরিফের মাদক সেবনকে হারাম বলেন?

- | | |
|----------|----------|
| ক. কুরআন | খ. হাদীস |
| গ. ইজমা | ঘ. কiyাস |

৮। আরিফের মাদক সেবন বন্ধ করতে -

- i. নতুন পরিবেশে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে হবে
- ii. পারিবারিকভাবে সহানুভূতি দেখাতে হবে
- iii. বন্ধু নির্বাচনে বাবা মায়ের অনুমতি নিতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সজীব ও সাঈদ দুই ভাই। দুজনই নিয়মিত নামায আদায় করে। কিন্তু সাঈদ শূন্যভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে না। সাঈদ কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে সজীব বললো, ‘নামাযে শূন্যভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হয় এবং কুরআন তিলাওয়াত হল উত্তম ইবাদাত।

- ক. তিলাওয়াত কী?
- খ. নামাযে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
- গ. সাঈদকে কুরআন তিলাওয়াত শূন্য করে শিখতে হলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে?
- ঘ. ‘কুরআন তিলাওয়াত উত্তম ইবাদাত।’- বিশ্লেষণ কর।

২। জনাব আব্দুল হক একজন আলেম। তাঁর সন্তান আবু বকর তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “আব্বা আমি যদি শুধু কুরআনের অর্থ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করি তাহলে কি আমি ইসলামে পরিপূর্ণ দাখেল হতে পারব?” তিনি বললেন - হ্যাঁ পারবে। তবে তোমাকে রাসূল (স) এর সুন্নাহ অনুযায়ী কুরআনের বিধান মানতে হবে। কারণ কুরআনের ব্যাখ্যা হল রাসূল (স)-এর সুন্নাহ। এরপর সে আরও কিছু প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চাইলে, জনাব আব্দুল হক বললেন, “হ্যাঁ, তোমাকে ইজমা ও কিয়াস সম্পর্কেও জানতে হবে।”

- ক. ইজমা অর্থ কি?
- খ. রাসূল (স)-এর সুন্নাহ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- গ. আবু বকরের জীবনে ইজমা ও কিয়াস কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ - ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. আবু বকরের জীবনে ইসলামের বিধান পালন করতে কুরআন ও হাদিসের ভূমিকা - বিশ্লেষণ কর।

৩। আরিফ তার প্রতিবেশী রফিকের কাছে জানতে চাইল - মৃত মাছ হালাল কিন্তু মৃত মুরগি হারাম কেন? রফিক সঠিক জবাব দিতে পারল না এবং তারা একজন আলেমের কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পর তারা বুঝতে সক্ষম হল এবং তারা এটাও অবগত হল যে, “হালাল খাদ্য ও হালাল উপার্জন ইবাদাত কবুল হওয়ার শর্ত।”

- ক. হালাল শব্দের অর্থ কী?
- খ. শরীআতের ভাষায় হারাম বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- গ. তিনটি হারাম বস্তু একটা তালিকা করে আরিফ কীভাবে তা ব্যাখ্যা করবে?
- ঘ. “হারাম খাদ্য ও উপার্জন দ্বারা ইবাদাত কবুল হয় না” - বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায়-৩

ইবাদাত (الْعِبَادَةُ)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দিয়েছেন অসংখ্য নিআমত। আমরা তাঁর বান্দা। আমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর প্রেরিত নবীর দেখানো পথে যে কাজ করি তাই ইবাদাত। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

অর্থ : “জিন ও মানুষ জাতিকে আমি আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।” (সূরা আয-যারিআত : ৫৬)

ইবাদাত মানে আনুগত্য করা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হল ইবাদাতের মূল লক্ষ্য। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন উত্তম কাজই ইবাদাত। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) কর্তৃক নির্দেশিত পথের সমস্ত কাজই ইবাদাত হিসেবে গণ্য।

আমরা কীভাবে ইবাদাত করব সে সমস্ত বিষয় ও পদ্ধতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) শিখিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝

“তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও রাসূলের, আর যদি তোমরা তা থেকে বিমুখ হও তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না।” (সূরা আলে-ইমরান : ৩২)

উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) কর্তৃক নির্দেশিত পথই ইবাদাতের মূল। সুতরাং এই নির্দেশিত কাজগুলো আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হব।

ইবাদাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানুষ জাতিকে ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর অন্য সব জীবকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। মানুষ আল্লাহর হুকুম পালন করবে এবং তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে।

ইবাদাত বলতে নিছক উপাসনা বোঝায় না। আল্লাহর নির্দেশিত পথে মুসলমানদের সকল কার্যই ইবাদাতের শামিল।

আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

অর্থ : “সালাত আদায় করার পর জমিনে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে ব্যাপ্ত হও এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।” (সূরা জুমুআ : ১০)

উপরিউক্ত আয়াতের মর্মকথা এই যে, আল্লাহর দেওয়া নির্দিষ্ট কাজগুলো যথাযথভাবে পালনের পর দুনিয়াতেও নিজ দায়িত্ব পালন করা ইবাদাতের শামিল।

আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথ মেনে দুনিয়াতে নিজ দায়িত্ব যদি যথাযথভাবে পালন করি, তবেই আল্লাহ আমাদের পুরস্কৃত করবেন। আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পাব।

হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ

হাক্কুল্লাহ

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাত করার জন্য। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ইবাদাত করি। আমাদের কীভাবে ইবাদাত করতে হবে, কী কাজ করতে হবে তা আল্লাহ তাআলা নিজেই নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যে ইবাদাত করি সেগুলো দুই পর্যায়ে। প্রথম পর্যায় শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট যেমন সালাত, সাওম ইত্যাদি। আমাদের স্বীকার করতে হবে সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত পৃথিবীর অস্তিত্বই সম্ভব হত না। আল্লাহ আছেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেন এবং ধ্বংস করেন। আমরা তাঁরই বান্দা। আমাদের জীবন-মরণ, আহা-নিদ্রা সবই তাঁর হাতে। একথা স্বীকার করা এবং মেনে নেওয়াই বান্দার ওপর আল্লাহর হুক। আল্লাহ তাআলা পাক কুরআনে ঘোষণা করেন-“জিন ও মানুষ জাতিকে আমি কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তারা শুধু আমারই ইবাদাত করবে।”

আল্লাহর হুক আদায় করতে হলে আমাদের নিম্নের কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে :

১. সামগ্রিক জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করা।
২. আল্লাহর দেওয়া হুকুম আহকাম মেনে চলা।
৩. নিজের সার্বিক সত্তা আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা এবং সর্বাবস্থায় তাঁর অনুগ্রহ কামনা করা।

আমাদেরকে উপরিউক্ত কাজগুলো ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে সম্পন্ন করতে হবে। সকল কাজকর্ম আল্লাহর হুকুম মত করতে হবে। তবেই আল্লাহর অধিকার আদায় হবে এবং তিনি আমাদের পুরস্কৃত করবেন।

হাক্কুল ইবাদ

আমরা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে একত্রে বসবাস করি। আমরা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে এক জন আরেক জনকে সাহায্য করি। পরস্পরের এই সাহায্য সহানুভূতিকেই বলা হয় হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হুক। বান্দার হুক সম্পর্কে নবী কারীম (স) বলেছেন- “নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার প্রতিপালকের, তোমার শরীরের ওপর তোমার স্ত্রীর ও তোমার সন্তানের হুক রয়েছে। অতএব, হুকদারকে তার হুক প্রদান কর।”

কুরআনুল কারীমের সূরা নিসার প্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের ওপর মানুষের অধিকারের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ফর্য করে দিয়েছেন। সেখানে এগুলো পরিহারকারী বা অস্বীকারকারীকে শেষ বিচারের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

মানুষের প্রতি মানুষের হুক বা অধিকারকে প্রথমত আটটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এ বিশেষ হুকগুলোর মধ্যে কিছু আছে যেগুলো আদায় করা সর্বাবস্থায় ফর্য। আবার কিছু আছে পরিস্থিতি অনুযায়ী ফর্য, কিছু আছে সাধারণ হুক। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হল।

১. নিকট আত্মীয়ের হুক (যা পালন করা ফর্য), ২. দূরবর্তী আত্মীয়ের হুক, ৩. প্রতিবেশীর হুক, ৪. দেশবাসীর হুক, ৫. শাসক-শাসিতের হুক, ৬. সাধারণ মুসলমানের হুক, ৭. অভাবী লোকের হুক, ৮. অমুসলিমদের হুক।

সালাত (الصَّلَاةُ)

পরিচয়

আল্লাহ তাআলার নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হল সালাত। সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট বান্দার চরম আনুগত্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়।

সালাত অর্থ দুআ। সালাতে বান্দা তাঁর প্রভুর নিকট দুআ বা প্রার্থনা করে বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে ‘সালাত’। ইসলাম পাঁচটি রুকনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পাঁচটি রুকন হল : “কালিমা, সালাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্জ। সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। কালিমার পরেই সালাতের স্থান। দিনরাত পাঁচ ওয়াক্তের সালাত মানুষকে জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধানের ওপর অবিচল থাকার অনুপ্রেরণা দান করে। ভুল-ভ্রান্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর আইন মেনে চলার উৎসাহ দান করে। পবিত্র কুরআনে বার বার সালাত কয়েম করার হুকুম দেওয়া

হয়েছে। বলা হয়েছে- **أَقِمِ الصَّلَاةَ** অর্থ : “সালাত কয়েম কর।” (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৮)

সালাত একা একা না পড়ে জামাআতের সাথে কয়েম করার জন্য বলা হয়েছে - **وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ**

অর্থ : “তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।” (সূরা আল-বাকারাহ : ৪৩)

অর্থাৎ জামাআতবন্দ্য হয়ে সালাত কয়েম কর। নবীজী বলেন- “জামাআতে সালাত আদায় করলে একাকী পড়ার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।”

সালাত মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে। আল্লাহ বলেন - **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ**

অর্থ : “নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।” (সূরা আল আনকাবূত : ৪৫)

হুযূর আক্রাম (স) বলেন- “যে ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করে, কিয়ামতের দিন ঐ সালাত তার জন্য নূর হয়ে দাঁড়াবে।” একদা নবীজী সাহাবীদের বললেন, “যদি কারও বাড়ির পাশ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয়, আর যদি প্রতি দিন কোন ব্যক্তি ঐ নদীতে গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে?” সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, “না, হে আল্লাহর রাসূল।” তখন হুযূর (স) বললেন, “পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও ঠিক তেমনি তাঁর গুনাহসমূহ দূর করে দেয়।” সালাত আদায়কারী নিষ্পাপ হয়ে যায়। সালাত ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী।

শরীআতের অনুমোদিত কারণ ছাড়া কোন অবস্থাতেই সালাত ত্যাগ করা যাবে না।

ধর্মীয় গুরুত্ব

সালাত ঈমান মজবুত করে। সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। সালাত মানুষের দেহ ও মনকে সকল প্রকার পাপ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে। মানুষ যখন সালাত আদায় করে তখন যাবতীয় গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। সালাত আদায়কারীকে আল্লাহ মাফ করে দেন।

সামাজিক গুরুত্ব

সালাত আদায়ে শুধু যে বান্দার উন্নতি হয় তাই নয়। সামাজিক ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। জামাআতে সালাত আদায় করলে মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচ বার একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে একে অপরের খোঁজখবর নিতে পারে। তাদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। জামাআতে একে অপরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াতে হয়। এভাবে একতাবন্দ্য হয়ে কাজ করার শিক্ষা সালাত থেকে পাওয়া যায়।

সালাতে রুকু সিজদাহ্ যথানিয়মে করতে হয়। এতে নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলার শিক্ষা পাওয়া যায়। আমরা নিয়মিত সালাত কয়েম করব। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলব।

যাকাত (الزَّكَاةُ)

আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনযাপনের জন্য সম্পদ দান করেছেন। সকল মানুষ সমান সম্পদের অধিকারী নয়। কারও কম আবার কারও বেশি। ধনীর সম্পদে আল্লাহ তাআলা গরিবের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। গরিবের সাহায্যের জন্য যাকাতের ব্যবস্থা করেছেন।

যাকাতের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধি। শরীআতের পরিভাষায়, মালিকে নিসাব মুসলমানদের ধন-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বছর পূর্তিতে আল্লাহর নির্ধারিত খাতসমূহে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়। যাকাত দিলে সম্পদ পবিত্র হয়। যাকাত ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে অন্যতম। যাকাত দেওয়া ফরয। গুরুত্বের দিক দিয়ে সালাতের পরই যাকাতের স্থান। যাকাত সম্পর্কে পাক কুরআনে বলা হয়েছে-

اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.

অর্থ : “সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর।” (সূরা আননূর-৫)

এ সম্পর্কে নবী কারীম (স) বলেন “যাদের ওপর যাকাত দেওয়া ফরয, তারা যদি তা আদায় না করে, তবে আল্লাহ তাআলা পরকালে তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন।”

বস্তুত কোন মুসলমান যাকাত না দিয়ে মুসলমান থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, “মুশরিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, কারণ তারা যাকাত দেয় না। সুতরাং যাকাত না দেওয়া মুশরিকদের কাজ।”

যাকাত আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ। যাকাত অস্বীকার করা আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করার শামিল। ইসলামী আইনে যাকাত দানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই তা আদায় করতে হবে।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে ঠিক সেভাবেই যুদ্ধ করেছিলেন, যেভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যাকাতদানের অস্বীকারকারীকে তিনি ইসলামচ্যুত (মুরতাদ) বলে গণ্য করেন।

যাকাত দানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল গরিবদের অবস্থার পরিবর্তন করা, যাতে তারা আর্থিকভাবে সচ্ছলতা লাভ করতে পারে, অভাব থেকে মুক্তি পায়।

আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করে এর দ্বারা অনেক গরিব লোকের কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। ছোট ছোট কুটির শিল্প গড়ে বেকারদের কর্মসংস্থান করতে পারলে সমগ্র দেশে এক দিন আর অভাবী লোক দেখা যাবে না। ফলে দেশের শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসবে। নিয়ম মত যাকাত দিলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না। কাজেই ধনীদের বিধিমত যাকাত আদায় করা একান্ত আবশ্যিক।

সাওম (الصَّوْمُ)

পরিচয়

সাওম অর্থ বিরত থাকা। ইসলামী পরিভাষায় সুব্হে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছায় পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার নাম সাওম।

প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নরনারীর ওপর সাওম ফরয। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

অর্থ : “তোমাদের ওপর সাওম পালন ফরয করা হল, যেমন ফরয করা হয়েছিল পূর্ববর্তী উম্মাতগণের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।” (সূরা আল-বাকার : ১৮৩)

কুরআন মাজীদে সাওমের তিনটি মৌলিক উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে—

১. তাকওয়া অর্জন
২. আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা
৩. আল্লাহর শোকর গুজার হওয়া।

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক বলেছেন— **الصَّوْمُ لِيْ وَآنَا أَجْزَى بِهٖ ۝**

অর্থ : “সাওম আমারই জন্য, আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।”

সাওমের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। সাওমের সওয়াব অত্যন্ত বেশি।

যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে অশেষ পুণ্যের অধিকারী হয়। মহানবী (স) বলেন : “সকল সৎ কাজের পুণ্য দশ গুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত হবে। কিন্তু সাওম একমাত্র আল্লাহরই জন্য বিধায় তার পুণ্য আল্লাহ নিজেই দেবেন।”

রোযাদার ব্যক্তি নিজে সকল প্রকার কু-রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। নবীজী বলেছেন— “সাওম ঈমানদারের জন্য ঢাল স্বরূপ।”

সাওম একটি মৌলিক ফরয কাজ। যদি কেউ তা অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির হয়ে যায়।

রমযান মাস ধৈর্যের মাস। এক মাস সাওম সাধনার মাধ্যমে বান্দার ধৈর্যের পরীক্ষা হয়। আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে রোযাদার বান্দাদের জান্নাত দান করবেন। মহানবী (স) বলেছেন— “রমযান মাস ধৈর্যের মাস এবং ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত।”

সামাজিক গুরুত্ব

১. সহানুভূতিশীল হওয়া : সাধারণত মানুষ ভোগবিলাসে অভ্যস্ত। সে তার নিজের সম্পদ শুধু নিজের জন্য ব্যবহার করতে চায়। ধনী ব্যক্তিগণ দরিদ্রের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অভাব-অনটনের যন্ত্রণা কখনও অনুভব করতে পারে না। সাওম ধনী-দরিদ্র সকলের ওপর ফরয হওয়ায় ধনীরা অনাহারে থাকার কষ্ট অনুভব করতে পারে। ফলে তারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়।
২. বদঅভ্যাস দূর হওয়া : মানুষের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দার মত ঘৃণ্য কতগুলো বদঅভ্যাস রয়েছে। কিন্তু সাওম পালনকারী ব্যক্তি এসব বদঅভ্যাস পরিহার করতে সচেষ্ট হয়। ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে।
৩. সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হওয়া : সাওম পালন করার সময় সওয়াব পাওয়ার আশায় মানুষ একে অপরকে সাহ্রী ও ইফতারী খাওয়ার জন্য আহ্বান জানায়, একে অপরের বাড়িতে ইফতারী পাঠায়। ফলে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

এছাড়াও সাওম পালনে অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। সাওম পালনের সময় রোযাদারগণ অতিরিক্ত পুণ্যের আশায় বেশি দান-খয়রাত করে থাকেন। ফলে দরিদ্র জনগণের আর্থিক অভাব অনেকটা লাঘব হয়। সুতরাং আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এবং সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সকলেরই সাওম পালন করা উচিত। আমরা নিষ্ঠার সাথে সাওম পালন করব।

হাজ্জ (الْحَجُّ)

পরিচয়

হাজ্জ অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। ইসলামী পরিভাষায় হাজ্জ অর্থ নির্দিষ্ট দিনসমূহে পবিত্র কা'বা ও নির্ধারিত কয়েকটি স্থানে আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশিত অনুষ্ঠান পালন। হাজ্জ ইসলামের পঞ্চম রুকন। হাজ্জ ঐ সমস্ত ধনী মুসলমানদের ওপর ফরয, যাঁরা পবিত্র মক্কায় যাতায়াত ও হাজ্জকিয়া সম্পাদন করার মত আর্থিক ও দৈহিক সজ্জাতি রাখেন। দরিদ্রদের ওপর হাজ্জ ফরয নয়। হাজ্জ সারা জীবনে মাত্র এক বারই ফরয হয়।



কুরআনুল কারীমে হাজ্জ সম্পর্কিত একটি পূর্ণ সূরাই নাযিল হয়েছে। এছাড়াও কুরআনের অন্যান্য জায়গাতেও হাজ্জ সম্পর্কিত অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন- **وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا .**

অর্থ : “ আল্লাহর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফে হাজ্জ পালন করা মানুষের ওপর অবশ্য কর্তব্য; মানুষের মধ্যে যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে।” (সূরা আলে-ইমরান : ৯৭)

আধ্যাত্মিক শিক্ষা

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হুযূর (স) বলেছেন-

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হাজ্জ পালন করল এবং কোন প্রকারের অন্যায় ও গুনাহর কাজ করল না, সে বাড়ি প্রত্যাবর্তনকালে এমন নিষাপ হয়ে ফিরল, যেন অদ্য তার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।”

হাজ্জ ধনী মুসলমানদের ওপর ফরয। এটা কেউ অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। হাজ্জ পালনকারী ব্যক্তি আল্লাহর খুবই প্রিয়বান্দা। আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। মহানবী (স) বলেন- “পানি যেমন ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়, হাজ্জও তেমনি মানুষের মনের ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়।”

সামাজিক শিক্ষা

হাজ্জের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের স্বরূপ প্রকাশ পায়। এ মিলন কেন্দ্রে পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমান মিলিত হন। হাজ্জ মুসলমানদের বিশ্বসম্মেলন। বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার নানা ভাষা, আকৃতি ও বর্ণের লক্ষ লক্ষ মুসলমান একই পোশাকে, একই নিয়মে হাজ্জব্রত উদযাপনে শরীক হন।

হাজ্জের মাধ্যমে মানুষের মন থেকে কপণতা, অপচয় প্রবণতা দূরীভূত হয়। আর মিতব্যয়ী হওয়ার দরুন দারিদ্র্য দূর হয়। অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। আমাদের সমাজে হাজ্জীদের মর্যাদা ও সম্মান অনেক বেশি।

আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার জন্য সাধারণ মানুষ হাজ্জীদের সম্মান করে থাকে। আল্লাহর আদেশ পালন ও আল্লাহর রহমত পেতে হলে ধনী মুসলমানদের যত শীঘ্রসম্ভব হাজ্জ আদায় করা উচিত।

জিহাদ (الْجِهَادُ)

পরিচয়

জিহাদ অর্থ কঠোর পরিশ্রম করা, চেষ্টা ও সাধনা করা। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর দ্বীনকে (ইসলামকে) বিজয়ী করার লক্ষ্যে সকল প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে দৈহিক, মানসিক, আর্থিক ও জ্ঞানবৃদ্ধি দিয়ে প্রচেষ্টা চালানোর নামই জিহাদ। ইসলাম ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা একটি বড় ইবাদাত। একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে সর্বোচ্চে স্থান দেওয়ার জন্য জিহাদ সংঘটিত হয়ে থাকে। কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে জিহাদ হতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন- **الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ**

অর্থ : “ঈমানদারগণ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর কাফিররা তাগুতের (শয়তানের) পথে যুদ্ধ করে।” (সূরা আননিসা : ৭৬)

মহানবী (স) বলেছেন : “যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে লড়াই (জিহাদ) করে, সেই আল্লাহর পথে আছে।”

আধ্যাত্মিক শিক্ষা

যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন তাঁদের বলা হয় মুজাহিদ। যাঁরা জিহাদে জয়লাভ করেন তারা হলেন ‘গাযী’। আর

যাঁরা প্রাণ দেন তাদের বলা হয় ‘শহীদ’। আল্লাহ তাআলার নিকট শহীদদের মর্যাদা অনেক বেশি। তাঁরা অমর। শহীদদের

প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন- **وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ ۖ (البقرة : ১৫৬)**

“যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদের তোমরা মৃত বল না, বরং তারা জীবিত।” (সূরা আল-বাকার : ১৫৬)

জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদ দুই প্রকার। যথা : ১. যাহিরী বা প্রকাশ্য জিহাদ। ২. বাতিনী বা অপ্রকাশ্য জিহাদ।

প্রকাশ্য জিহাদ

ইসলামের চিরশত্রু কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদী ইত্যাদি। এরা সর্বদা ইসলামকে দুনিয়া থেকে মুছে দিতে চায়। এই আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে প্রকাশ্য জিহাদ বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

“হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও।” (সূরা তাওবা : ৭৩)”

অপ্রকাশ্য জিহাদ

ইবলিস ও কু-প্রবৃত্তি মানুষের চরম শত্রু। শয়তানের ফাঁদে পড়ে কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়। এই চরম শত্রু ইবলিস ও কু-প্রবৃত্তির (নফস) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে বাতিনী জিহাদ বলা হয়। কু-প্রবৃত্তিকে দমন করা কঠিন কাজ। তাই একে বড় জিহাদ বলা হয়। কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানকে দমন করতে পারলে জান্নাতের পথ সুগম হয়। নবী কারীম (স) বলেছেন- নফস বা কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হল বৃহত্তর জিহাদ।” আল্লাহর দ্বীন কায়েম তথা দুনিয়াতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জিহাদ করা প্রতিটি মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব। ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় নিজের জানমাল সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। আমরা ইসলামের পথে চলব। ধর্মদ্রোহীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করব।

পিতামাতার অধিকার (حُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। আর পিতামাতার ওসিলাতেই মানুষ এ সুন্দর পৃথিবীতে আগমন করে। মাতাপিতাই সবচেয়ে আপন জন। সন্তানের জন্য তাঁদের ত্যাগের অন্ত নেই। সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে কতই না অসহায় থাকে। তখন পিতামাতাই সন্তানের সকল প্রয়োজন মিটিয়ে পরম আদর যত্নে লালনপালন করেন। আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের পরই পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সবচেয়ে বেশি।

পিতামাতা যাতে সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারেন সেদিকে সকলের দৃষ্টি রাখতে হবে। তাঁদের মনে কষ্ট হতে পারে, এমন কোন কাজ করব না বা এমন কথা বলব না। বিশেষ করে তাঁরা যখন বৃদ্ধ হয়ে যান, দুর্বল হয়ে পড়েন, উপার্জন করতে পারেন না, সন্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন; তখন তাঁদের প্রতি অধিক পরিমাণে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ জন্য কুরআন মাজীদে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআন পাকে এরশাদ হয়েছে-

“তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করবে। যদি তাঁদের এক জন কিংবা উভয়ই তোমার সামনে বার্ষিক্যে উপনীত হন, তবে তুমি তাঁদের প্রতি “উহ!” শব্দটিও উচ্চারণ করো না। তাঁদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলবে না। বরং তাঁদের সাথে সম্মানসূচক ভাষায় কথা বলবে। তাঁদের জন্য দয়া পরবশ হয়ে বিনয়ের বাহু অবনমিত কর। তাঁদের সেবায় আত্মনিয়োগ কর এবং বল, “হে আল্লাহ, আমার পিতামাতা শৈশবে যেমন স্নেহ-মমতা দিয়ে আমাকে লালন পালন করেছিলেন, আপনি তাঁদের প্রতি তেমনি সদয় হউন।” (সূরা বনী ইসরাইল : ২৩-২৫)

আল্লাহর ইবাদাত করা, শিরক না করা এবং পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করা এক জন মানুষের পক্ষে সমান গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন- **وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا**।

অর্থ : “তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না এবং পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ কর।” (সূরা আননিসা : ৩৬)

পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি। হাদীস শরীফে আছে-“পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাঁর অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।”

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পিতামাতার আদেশ মেনে চলা সন্তানের অপরিহার্য কর্তব্য। তবে পিতামাতা যদি ইসলাম বিরোধী কোন কার্যকলাপের নির্দেশ দেন বা চাপ সৃষ্টি করেন সেক্ষেত্রে সন্তানকে পিতামাতার আদেশ অমান্য করে আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে হবে। কিন্তু এমন অবস্থাতেও সন্তান পিতামাতাকে ত্যাগ করতে পারবে না।

পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এই গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। বরং পরকালে অবধারিত শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও তাকে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে নবীজী (স) বলেছেন- “আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছা মত বান্দার সকল গুনাহ মাফ করে দেন। কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যতার গুনাহ মাফ করেন না বরং এই গুনাহগারকে পার্থিব জীবনে মৃত্যুর পূর্বেই শাস্তি দিয়ে থাকেন।”

সন্তানের ওপর পিতামাতা উভয়েরই হক আছে। তবে পিতার হকের চেয়ে মাতার হক বেশি। একদা এক ব্যক্তি নবী কারীম (স)-এর দরবারে এসে আর্য করল, হুযূর! আমার মা-বাবা উভয় জীবিত আছেন, আমি তাঁদের খেদমত করতে চাই। তবে কার হক আগে আদায় করব? নবীজী উত্তরে বললেন- “তোমার মাতার।” লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, “তারপর?” নবীজী বললেন, “তোমার মাতার।” তৃতীয় বার একই প্রশ্ন করলে নবীজী উত্তরে বললেন, “তোমার মাতার।” চতুর্থ বার একই প্রশ্ন করলে নবীজী উত্তরে বললেন, “তোমার পিতার।” অতএব বোঝা গেল যে, পিতা অপেক্ষা মাতার হক অধিক।

মাতার হক সম্পর্কে নবী কারীম (স) বলেছেন- **الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ**

অর্থ : “মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।”

দুনিয়ার জীবনে শান্তি পেতে হলে এবং পরকালে জান্নাতের অফুরন্ত সুখভোগ করতে হলে অবশ্যই পিতামাতার বাধ্যগত হতে হবে। আমাদের জীবনে সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে পিতামাতার সন্তুষ্টির ওপর। কাজেই কোন অবস্থাতেই পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় এবং তাঁদের সাথে সর্বদা ভাল ব্যবহার করা কর্তব্য।

আমরা পিতামাতার কথামত চলব। তাঁদের সেবা করব। তাতে আল্লাহ খুশি হবেন। আমরা আল্লাহর রহমত পাব। আমাদের জীবন উন্নত হবে।

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

মানুষ পৃথিবীতে সংসারের মায়ায় আবদ্ধ। এ সংসারে মাতাপিতা, ভাইবোন, দাদা দাদি, চাচা চাচি, ফুফু ফুপা এবং বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়ে অনেকেই আত্মীয়। মাতাপিতার কর্তব্য আদায়ের পর এ সকল আত্মীয়-স্বজন আমাদের নিকট সহযোগিতা ও সদ্যবহার পাওয়ার হকদার।

ইসলামী জীবনযাপনে এ সকল আত্মীয়-স্বজনের হক যথাযথভাবে আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। এ সম্পর্কে পাক কুরআনে এরশাদ হয়েছে- **وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ**।

অর্থ : “তুমি তোমার আত্মীয়ের অধিকার আদায় কর।” (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬)

তাদের সাথে ভাল আচরণ করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।

আত্মীয়-স্বজনের হক ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে তাকীদ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- **أَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَى**

অর্থ : “সত্যিকার ধর্মপরায়ণ তারাই, যারা ধন সম্পদের প্রতি তাদের ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনকে দান করে।” (সূরা আল বাকারা : ১৭৭)

নিকট আত্মীয়কে দান করা সম্পর্কে নবী কারীম (স) বলেছেন, “নিকট আত্মীয়কে অর্থ দান করা হলে এক সঙ্গে দুইটি কাজ হয়। একটি হল আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়টি হল দান করা।”

সুতরাং নিকট আত্মীয়ের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে দূরবর্তী লোকদের দান করলে আল্লাহ তা পছন্দ করেন না। বরং নিকট আত্মীয়কে দান করাই সর্ব প্রথম কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ (স) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সম্পর্কে বলেছেন- **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَّحِمٍ**

অর্থ : “আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।”

আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন। যারা তা রক্ষা করে না, তারা অবশ্যই কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। ইহকালে সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হলে পরকালে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।

সুতরাং আল্লাহর গণ্য থেকে রক্ষা পেতে এবং রহমত লাভ করতে হলে আমাদের আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় করতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। অতএব ইসলামের নির্দেশিত সীমা অতিক্রম না করে আত্মীয়ের হক আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে।

প্রতিবেশীর অধিকার

আমাদের আশপাশে যারা বাস করেন তাঁরাই প্রতিবেশী। আমাদের সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে তাঁরাই প্রথম এগিয়ে আসেন। কোন বিপদ হলে, অসুখ হলে তাঁরা সেবা করেন, যত্ন নেন। বিবাহ-শাদী বা যে কোন অনুষ্ঠানে তাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেন।

প্রতিবেশী কারা? এ সম্পর্কে নবী কারীম (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন- “সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত সবাই প্রতিবেশী।”

অধিকারের দিক দিয়ে প্রতিবেশীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

১. যার তিনটি হক রয়েছে। মুসলমান আত্মীয় প্রতিবেশী : (ক) মুসলমান হিসেবে, (খ) আত্মীয় হিসেবে (গ) প্রতিবেশী হিসেবে।
২. যার দুটি হক রয়েছে। মুসলমান প্রতিবেশী : (ক) মুসলমান হিসেবে (খ) প্রতিবেশী হিসেবে।
৩. যার একটি মাত্র হক রয়েছে। সেটি হল প্রতিবেশীর হক। অর্থাৎ প্রতিবেশী অন্য ধর্মাবলম্বী হলেও প্রতিবেশী হিসেবে তাঁর সৌজন্যমূলক ব্যবহার পাওয়ার অবশ্যই অধিকার আছে।

প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকা, তাঁদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা প্রতিটি মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। প্রতিবেশী যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন সকলের প্রতি আল্লাহ সৌজন্যমূলক আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

যারা প্রতিবেশীর হক আদায় করে না, তাদের সম্পর্কে নবীজী (স) বলেছেন, “যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ হতে রক্ষা পায় না সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।”

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। প্রতিবেশী যদি এ অপরাধ মাফ না করেন, তাহলে বেহেশতে যাওয়ার অধিকার হারাতে হবে। কাজেই তা কবীরা গুনাহ। প্রতিবেশী সৎকাজে সাহায্য চাইলে সাহায্য করতে হবে, অভাবে থাকলে অভাব মোচনের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন-“যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, সে প্রকৃত ঈমানদার নয়।”

প্রতিবেশী মুসলিম হোক কি অমুসলিম হোক প্রতিবেশী হিসেবে ভাল আচরণ পাওয়ার তাঁর অধিকার রয়েছে।

অমুসলিম প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে মুসলিম মনীষীগণ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। হযরত আবু হানীফা (র)-এর এক প্রতিবেশী ছিল অগ্নি উপাসক। লোকটি ছিল মদ্যপায়ী। সারারাত মদ পান করে, ঢোল পিটিয়ে এবং চিৎকার করে ইমাম সাহেবের ইবাদাত বন্দেশী ও লেখাপড়ার অসুবিধা করত।

এক দিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী লোকেরা ইমাম সাহেবের সেই প্রতিবেশীকে ধরে নিয়ে গেল। ঐ রাতে ইমাম সাহেব তার বাড়িতে কোন শব্দ না শুনে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সংবাদে ব্যথিত হয়ে তিনি তাকে মুক্ত করতে গেলেন। কাজী সাহেব ইমাম সাহেবকে বললেন, “তুমি আপনাকে কষ্ট দেয় বলেই তো তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।” ইমাম সাহেব বললেন : “সে আমার প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর হক আদায়ের জন্যই আমি তাকে নিতে এসেছি।” অবশেষে ইমাম সাহেবের জামানতে তাকে মুক্তি প্রদান করা হল। ইমাম সাহেবের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে লোকটি ভাল হয়ে গেল।

প্রতিবেশী অমুসলিম হলেও অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।

আমরা প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করব। তাদের সুখে-দুঃখে শরীক হব। আমাদের জীবন সুন্দর হবে, শান্তিময় হবে।

অসহায় দরিদ্রের অধিকার

সমাজের ধনী ব্যক্তিদের অসহায় দরিদ্র লোকদের প্রতি কর্তব্য রয়েছে।

যারা জীবন সংগ্রামে ব্যর্থতার সম্মুখীন, দারিদ্র্যের কষাঘাতে যাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, যারা বিপদগ্রস্ত তাদের অধিকার রয়েছে প্রতিটি ধনী মুসলমানের ধন-সম্পদে। কুরআন ও হাদীসে গরিব-দুঃখী মানুষের উপকার সাধনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

অর্থ : “তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের হক বা অধিকার রয়েছে।” (সূরা যারিয়াত : ১৯)

ইসলামই সর্বপ্রথম ইয়াতীম, মিসকীন, দুস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য জোর তাকীদ দিয়েছে।

দরিদ্রকে দান করলে ধনসম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। হাদীসে আছে, কোন ব্যক্তি যদি হালাল পথে উপার্জিত সম্পদ দান করে সেই দানকৃত বস্তু যদি একটি খেজুর পরিমাণও হয় তবে আল্লাহ তাআলা তাকে পাহাড় পরিমাণ নেকী দেবেন। মহানবী (স) বলেছেন- “মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম ঘর সেটি, যে ঘরে ইয়াতীম রয়েছে এবং তার সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়। আর মন্দ ঘর সেটি যে ঘরে ইয়াতীম আছে কিন্তু তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।”

প্রিয়নবী (স) বলেছেন- “যে ব্যক্তি ক্ষুধার্তকে অনুদান করে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে ফল খাওয়াবেন। যে তৃষ্ণার্তকে পানি পান করায়, আল্লাহ তাকে জান্নাতে শরবত পান করাবেন। যে কোন দরিদ্রকে বস্ত্র দান করে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে পোশাক দান করবেন।” (তিরমিযী)

আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করে পরকালে শান্তি পেতে হলে অসহায় দরিদ্রের হক যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। তাদের বিপদে-আপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক

পিতামাতার পরই শিক্ষকের মর্যাদা। শিক্ষক পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁরা আমাদের এ পৃথিবীতে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। পিতামাতা সন্তানের লালনপালন করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন শিক্ষক।

শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। কাজেই একজন শিক্ষক শিশুদের যে শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, শিশুরা তাই শিখবে। আমাদের জীবনের কর্মক্ষেত্র কী হবে, একজন সফল শিক্ষক ছোট অবস্থাতেই তা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, বিনয়, নম্রতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন, যা শিক্ষার্থী তার পরিণত বয়সে কাজে লাগিয়ে সার্বিক উন্নতি লাভ করে থাকে। আমাদের সার্বিক কল্যাণ কামনায় শিক্ষকগণ যে আত্মত্যাগের পরিচয় দেন তার জন্য তাঁদের যথাযথ শ্রদ্ধা করা ইবাদাতের শামিল।

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের জন্য আমরা প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছি আমাদের ওপর তাঁদের হক আছে। শিক্ষকের হক আদায় করতে হলে আমাদের নিম্নে বর্ণিত নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে :

১. শিক্ষকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।
২. সাক্ষাতে বিনয়ের সাথে সালাম দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করা।
৩. যা শিক্ষা দেন তা মনোযোগ সহকারে শোনা ও পালন করা।
৪. সর্বদাই নম্র আচরণ করা।
৫. শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের সাথে সাথে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা এবং কোন প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে অনুমতি নিয়ে যাওয়া।
৬. বিপদে-আপদে খোঁজখবর নেওয়া এবং যথাসাধ্য সাহায্য করা।
৭. এমন কাজ পরিহার করা যা তাঁরা অপছন্দ করেন।
৮. কোন অবস্থাতেই বেয়াদবি না করা।

মনে রাখতে হবে শিক্ষকের দুআ ও শ্রমই জীবনের উন্নতির চাবিকাঠি। শিক্ষক মনে কষ্ট পেয়ে বদদুআ করলে জীবনে উন্নতি লাভ সম্ভব নয়।

আমরা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করব। তাঁদের কথা মেনে চলব। তবেই আমাদের জীবন সুন্দর হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পাব।

বড়-ছোট সম্পর্ক

আমাদের মাঝে পিতামাতা, পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কেউ বয়োজ্যেষ্ঠ আবার কেউ বয়োনিষ্ঠ। ছোটদের প্রতি বড়দের প্রধান দাবি হল- তারা ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান পাবে। পক্ষান্তরে ছোটদেরও বড়দের নিকট থেকে আদর, স্নেহ, মায়ামমতা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বড়দের অধিকার সম্বন্ধে নবী কারীম (স) বলেন- “পুত্রের ওপর যেমন পিতার অধিকার রয়েছে তেমনি ছোট ভাইয়ের ওপর বড় ভাইয়ের অধিকার রয়েছে।”

তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন- **مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا**

অর্থ : “যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া দেখায় না এবং ছোটদের কাছে আমাদের বড়দের কী কী অধিকার আছে তা সে জানে না সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়।”

বড়দের প্রতি ছোটদের শ্রদ্ধাভক্তি ও ছোটদের প্রতি বড়দের মায়ামমতা, স্নেহ-ভালাবাসার মাধ্যমেই একটি সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে মুসলমান হতে হলে বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং বয়োনিষ্ঠদের অবশ্যই স্নেহ করতে হবে। তাহলে সমাজে প্রকৃত সুখ-শান্তি বিরাজ করবে। কাজেই ইসলামী বিধান মতে বড়দের মান্য এবং ছোটদের স্নেহ করা একান্ত কর্তব্য।

শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। বড়রা যে যে কাজ করে, ছোট শিশু তাকে অনুসরণ করে সে কাজ করতে চেষ্টা করে। সুতরাং ছোটদের উন্নত চরিত্র ও মানসিকতা গড়ে তোলা বড়দের প্রধান দায়িত্ব। অন্যদিকে ছোটদেরও বড়দের আদেশ-উপদেশ মেনে চলা প্রয়োজন।

যানবাহনে বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। কোন বৃন্দলোক বাসে বা ট্রেনে যাতায়াতকালে তাঁর যেন কষ্ট না হয় সেজন্য বাহনে ওঠার সময় সাহায্য করা, দাঁড়িয়ে থাকলে বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া কেবল সম্মান প্রদর্শনই নয়; বরং পুণ্যেরও কাজ। তাই সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে হলে বড়-ছোট মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে চলা অবশ্যই কর্তব্য। অতএব আমরা বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করব আর বয়োজনিকদের স্নেহ করব।

মালিক শ্রমিকদের সম্পর্ক

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি মানুষ তার মৌলিক প্রয়োজন অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি পূরণ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

মানুষের প্রত্যেকের ক্ষমতা সমান নয়। কেউ মালিক কেউ শ্রমিক। অর্থাৎ প্রত্যেকে তার নিজ দক্ষতা অনুসারে কাজ করে থাকে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে কোন কাজকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পরের কাজ করা তথা শ্রমের মূল্য আদায় বা গ্রহণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে মোটেই ঘৃণার কাজ নয়। আমাদের নবী কারীম (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন প্রকার উপার্জন উত্তম ও পবিত্রতম? তিনি উত্তরে জানানলেন, “কোন ব্যক্তির নিজ শ্রমের উপার্জন এবং সং ব্যবসালব্ধ মুনাফা।”

উপার্জনে হালাল যে কোন বৈধ পথ অবলম্বন করায় কারও মনে কোনরূপ হীনমন্যতাবোধ জাগ্রত হওয়া উচিত নয়। মজুর নিজেকে খাটো মনে করবে না, পক্ষান্তরে মালিকও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে না। মূলত পণ্য উৎপাদনে মূলধন ও শ্রম অপরিহার্য। এ ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয়। কাজেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরস্পরকে পরস্পরের সহযোগী মনে করতে হবে। এক জন অন্য জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করা উচিত না।

মজুরের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে নবী কারীম (স) বলেছেন : “যারা তোমাদের কাজ করে জীবিকা উপার্জন করে, সেই শ্রমিক তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই যাদের কাছে এমন লোক রয়েছে, তাদেরকে যেন সে তাই খেতে দেয় সে নিজে যা খায়; তাদেরকে যেন তাই পরতে দেয়, সে নিজে যা পরে। তার ক্ষমতার বাইরে কোন কাজ যেন তাকে করতে বাধ্য না করে। এমন কাজ করতে দিলে সেই কাজ সমাধার ব্যাপারে যেন তাকে উপযুক্ত সাহায্য সহযোগিতা দান করে।”

হাদীসে আছে, ধনীর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পরের হক আদায় করতে অকারণে বিলম্ব করা যুলুম।

মহানবী (স) বলেন- **أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ** -

অর্থ : “শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।”

পারিশ্রমিক দিতে অকারণে বিলম্ব করা সমীচীন নয়। শ্রমিক যাতে তার শ্রমের সঠিক মূল্য পায় সেজন্য মহানবী (স) বলেছেন, “মজুরের বেতন নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিযুক্ত করবে না।”

শ্রমিক-মালিকের কার্যকলাপের যে নীতিমালা ইসলাম দিয়েছে তা অনুসরণ করলে শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হবে না এবং মালিক-শ্রমিকের মধ্যে কোন দিন মনোমালিন্যও হবে না। কাজেই দেশ ও জাতির উন্নতিকল্পে এ ব্যাপারে ইসলামী নীতিমালা অবশ্যই মেনে চলা উচিত।

নারীর মর্যাদা

আল্লাহ সর্বপ্রথম মানুষ হিসেবে হযরত আদম (আ)-কে এবং তাঁর সঙ্গী হিসেবে বিবি হাওয়া (আ) কে সৃষ্টি করে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সুতরাং দুনিয়ার আদি পুরুষ হযরত আদম (আ) এবং আদি নারী বিবি হাওয়া (আ)। এ দু জন থেকেই পৃথিবীতে সকল নরনারীর সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীকে তুচ্ছ মনে করা হত। বর্তমানেও কোন কোন ধর্মে সামাজিকভাবে তাকে নগণ্য মনে করা হয়। কিন্তু ইসলাম ধর্মে নারীকে দেওয়া হয়েছে পূর্ণ মর্যাদা যা অন্য কোন ধর্মে দেওয়া হয়নি। ইসলাম ধর্মে মাতা, কন্যা, ভগ্নী, স্ত্রী প্রভৃতি হিসেবে নারীদের বিশেষ অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি রয়েছে। প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা করা নরনারী উভয়ের ওপরই ফরয।

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিপন্নকে আশ্রয় দান, প্রয়োজনে ঘর থেকে নিজ আব্রু (পর্দা) রক্ষা করে বাইরে গমন, মসজিদে জামাআতে शामिल, সমাজ কল্যাণমূলক কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, জিহাদে অংশগ্রহণ প্রভৃতি কাজে পুরুষের ন্যায় নারীরা অংশগ্রহণের অধিকার রাখে। শালীনতা বজায় রেখে যে কোন বৈধ কাজ তারা করতে পারে। তবে অবশ্যই নারীদের পর্দা রক্ষা করে কাজ করতে হবে।

ইসলামই সর্বপ্রথম নারীদের সম্পত্তিতে অংশীদার করেছে। এক জন নারী তার নিজস্ব সম্পদ ছাড়াও স্বামীর এবং পিতার সম্পত্তিরও অংশীদার। নারী যত সম্পদশালীই হোক না কেন তার খোরপোষের দায়িত্ব তার স্বামীর ওপর। তাঁর নিজস্ব ধন-সম্পদ তাঁরই ইচ্ছামত ব্যয় করার অধিকার ইসলাম দিয়েছে।

নারীদের সম্পত্তির অধিকারের ব্যাপারে পাক কুরআনে বলা হয়েছে- “পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীর অংশ আছে। তা অল্পই হোক আর বেশি হোক, নারীর অধিকার কখনই খর্ব করা চলবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অপরের সহযোগী, প্রতিযোগী নয়। তবে আল্লাহপাক পুরুষকে নারীর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। নারীরা হচ্ছে মায়ের জাতি। মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে নবী কারীম (স) বলেন-

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ অর্থ : “মাতার পদতলে সন্তানের জান্নাত।”

নারীর অধিকার সম্বন্ধে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ‘সূরা নিসা’ নামে পূর্ণ একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন। জাহেলী যুগে নারীদের সাথে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হত। নারীদেরকে বাজারে পণ্য হিসেবে কেনাবেচা করত, কন্যা সন্তান জন্ম নিলে অকল্যাণ মনে করত এবং জীবন্ত পুঁতে ফেলত। পৃথিবীতে যত ধর্ম ও জাতি রয়েছে তার মধ্যে একমাত্র ইসলামই নারীদের পুরুষের সাথে সমঅধিকার ও পূর্ণ মর্যাদা দান করেছে।

কাজেই ইসলাম ধর্মের পূর্ণ অনুসারী হিসেবে, নারীদের অধিকার আদায়ের প্রতি আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

- ১। কাকে সাহায্য করলে সম্পর্ক রক্ষা করা ও দান করা দুই-ই অর্জিত হয়?

ক. অতিথিকে	খ. নিকটাত্মীয়কে
গ. এতিমকে	ঘ. প্রতিবেশীকে
- ২। সালাত মানুষের কী উপকার করে?

ক. জাহান্নামে প্রবেশাধিকার দেয়	খ. খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে
গ. সমাজে সম্মান দান করে	ঘ. দীর্ঘায়ু দান করে।
- ৩। আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের পরে কার স্থান?

ক. শিক্ষকের স্থান	খ. মাতাপিতার স্থান
গ. মুরবিদের স্থান	ঘ. আলিমগণের স্থান
- ৪। প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রাখলে -
 - i. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়
 - ii. ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়
 - iii. পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রফিকুল ইসলাম ফজরের নামাযের জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে মসজিদে গেল। সেখানে সে ইমামকে রুকুতে পেল।

৫। রফিকুল ইসলাম নিয়াত করবে –

- i. আরবিতে
- ii. মাতৃভাষায়
- iii. মনে মনে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|-----------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও ii |

৬। এমতাবস্থায় রফিকুল ইসলাম

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ক. মনে মনে নিয়াত করে রুকুতে যাবে | খ. নিয়াত না করে রুকুতে যাবে |
| গ. নিয়াত করে দাঁড়িয়ে থাকবে | ঘ. আরবিতে নিয়াত করে রুকুতে যাবে। |

নিচের বর্ণনা থেকে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বেলাল মিয়া একজন কর্মকর্তা। তিনি নিয়মিত নামায পড়েন এবং রোযা রাখেন। তিনি কিন্তু বাড়তি টাকা না পেলে তিনি তার অফিসে ফাইল ছাড়েন না। তিনি দান-খয়রাত এবং নফল ইবাদাত করেন। একজন মুফতি বলেন, বেলালের নামায রোযা কবুল হবে না।

৭। বেলাল মিয়ার অপরাধ কোনটি?

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ক. দায়িত্বে অবহেলা | খ. শৃঙ্খলা ভঙ্গ |
| গ. ঘৃষ গ্রহণ | ঘ. অসদাচরণ |

৮। বেলাল মিয়ার নামায-রোযা কবুল না হওয়ার কারণ –

- i. টাকা ছাড়া ফাইল ছাড়েন না
- ii. দান-খয়রাত করেন
- iii. নফল ইবাদাত করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৯, ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব হাফিজুর রহমান একজন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি অসহায় দরিদ্রদের দান-সাদকা করে থাকেন। তিনি মনে করেন যাকাতের মাধ্যমে যেহেতু দরিদ্রদের সাহায্য করা হয়, সেহেতু দান-সাদকার মাধ্যমে সাহায্য করছি। সুতরাং তার আলাদাভাবে যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

৯। ইসলামের দৃষ্টিতে জনাব হাফিজুর রহমানের এ ধারণা –

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| ক. সম্পূর্ণ ঠিক | খ. মোটেও ঠিক নয় |
| গ. অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক | ঘ. আংশিক ঠিক |

১০। যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হল –

- i. ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ
- ii. বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন
- iii. আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় গরিবদের অবস্থার পরিবর্তন।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|------------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii এবং iii |

১১। এ ক্ষেত্রে জনাব হাফিজুর রহমানের কর্তব্য হল -

- তিনি বিধি মোতাবেক যাকাত আদায় করবেন
- বেশি বেশি দান করে যাবেন
- বেশি বেশি জনকল্যাণমূলক কাজ করবেন।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|------------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii এবং iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ইউসুফ আলী তার গ্রামের গরিবদের বাছাই করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাউকে গরু, কাউকে ছাগল এবং কাউকে হাঁস-মুরগি কেনার জন্য টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। এরপর তিনি তাদের বলেন, “আগামী বছর মূল টাকা ফেরত দিলে এর দ্বিগুণ টাকা সাহায্য করব। আর যদি কেউ ফেরত দিতে না পারে তাহলে পরবর্তীতে কোনো আর্থিক সাহায্য করব না।” ইউসুফ আলী গ্রামবাসীকে জানাননি যে, এই টাকা তার যাকাতের টাকা। এ বিষয়ে তিনি কয়েকজন আলেমের সাথে আলাপ করলে তাঁরা তাকে কিয়াস করার পরামর্শ দেন এবং বলেন, আল্লাহ বলেছেন, “তাদের (ধনীদের) ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে।”
 - কিয়াস কী?
 - যাকাত দানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
 - ইউসুফ সাহেবের আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে গরিবদের স্বাবলম্বী করার বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।
 - “তাদের (ধনীদের) ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে।”- অনুচ্ছেদের আলোকে বিশ্লেষণ কর।
- সবুজ মিয়া ও মিজানুর রহমান একে অন্যের প্রতিবেশী। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে। মিজানুর রহমান জমির আইল (সীমানা) কাটতে কাটতে সবুজ মিয়ার সীমানার মধ্যে বেশ কয়েক হাত চলে এসেছে। সবুজ মিয়া শহরে চাকরি করে বিধায় নিয়মিত তার জমি দেখাশুনা করতে পারে না। সবুজ মিয়া এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়।
 - মিজানুর রহমানের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে কিসের পরিপন্থী?
 - প্রতিবেশীর হক বর্ণনা কর।
 - সবুজ মিয়া এ অবস্থা থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
 - মিজানুর রহমানের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে কিরূপ হয়েছে – বিশ্লেষণ কর।
- টিফিন পিরিয়ডে রাফিদের বন্ধুরা মাঠে খেলতে যাচ্ছিল। তখন রাফিদ বলল, “চল আমরা সবাই নামাযে যাই।” কারণ আল্লাহ বলেছেন, “নামায কয়েম কর এবং নিশ্চয়ই নামায মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।” একথা শুনে ফাহিম ছাড়া সকলেই মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করল।
 - নামায কী?
 - ‘নামায মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে’- বলতে কী বোঝ?
 - বন্ধু ফাহিমকে রাফিদ আর কীভাবে নামায আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?
 - ‘জামাআতে নামায আদায় করার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়’- মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক (الْأَخْلَاقُ)

পরিচিতি

আখলাক শব্দটি খলুকুন-এর বহুবচন। এর অর্থ স্বভাব-সমষ্টি বা চরিত্র। আখলাক বলতে সচ্চরিত্র ও দুষ্চরিত্র দুইটিই বুঝায়। সচ্চরিত্রকে আখলাকে হামীদাহ্ এবং দুষ্চরিত্রকে আখলাকে যামীমাহ্ বলে। মানুষের স্বভাব যখন সামগ্রিকভাবে সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত হয়, তখন তাকে আখলাকে হামীদাহ্ বা সচ্চরিত্র বলে। যে স্বভাব বা আচরণ সব সমাজে প্রশংসনীয় ও সমাদৃত এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের কাছে প্রিয় তাকে আখলাকে হামীদাহ্ বা প্রশংসনীয় আচরণ বলে। যেমন- তাকওয়া এবং এর থেকে উৎসারিত- সততা, আমানতদারী, ওয়াদাপালন, আদল, অসহায় ও দুস্থদের সেবা, পরিচ্ছন্নতা, শালীনতা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় মানুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড ইসলামী শরীআত অনুসারে সুষ্ঠু, সুন্দর, কল্যাণকর ও যথাযথভাবে পালন করাকে আখলাকে হামীদাহ্ বলে। সহজ সুন্দর স্বভাব ও ভাল চরিত্রকে আখলাকে হামীদাহ্ বলে।

গুরুত্ব

আখলাকে হামীদাহ্ মৌলিক মানবীয় গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এছাড়া অন্য সব সম্পদ অর্থহীন। মানুষের পার্থিব জীবনের যাবতীয় সুখশান্তি ও নিরাপত্তা যেমন উত্তম আখলাকের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি তার পরকালের সুখশান্তি ও মুক্তি এর ওপরই নির্ভর করে। মানুষের স্বভাব-চরিত্র যত সুন্দর হবে, সে ততই সৎকর্মশীল হবে এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় হবে।

মহানবী (স) বলেছেন- **الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ** অর্থ : “সুন্দর ব্যবহারই পুণ্য।”

রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল- কোন কাজের জন্য অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন-

تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ অর্থ : “আল্লাহর ভয়, আর উত্তম চরিত্র।”

তিনি আরও বলেন- “নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি ভারী হবে তা হল উত্তম চরিত্র।”

খাঁটি মুমিন হতে হলে স্বভাব-চরিত্র সুন্দর হতে হয়। এ সম্পর্কে মহানবী (স) বলেছেন, “সত্যিকার মুমিন তাঁরাই, যাঁদের চরিত্র সুন্দর।”

আর মানুষের যেসব আচরণ বা স্বভাব সব যুগে সব সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় তাকে আখলাকে যামীমাহ্ বলে। যেমন মিথ্যা, প্রতারণা, পাপাচার, খিয়ানত, যুলুম, পরনিন্দা, পরচর্চা, ফিতনা-ফাসাদ ইত্যাদি।

এখানে আমরা সচ্চরিত্রের মূল সঞ্জীবনী শক্তি ‘তাকওয়া’ এবং তাকওয়া থেকে উৎসারিত কয়েকটি সদগুণের আলোচনা করব।

তাকওয়া (التَّقْوَى)

পরিচয়

তাকওয়া শব্দের অর্থ আল্লাহ ভীতি, পরহেযগারী, আত্মশুদ্ধি, বিরত থাকা এবং নিজেকে বিপদ থেকে রক্ষা করা। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহর ভয়ে সবরকম অন্যায়-অনাচার, পাপাচার বর্জন করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশমত জীবনযাপন করাকে তাকওয়া বলে। আল্লাহকে ভয় করার অর্থ আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা। আল্লাহ আমাদের

সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি আমাদের ভালমন্দ বুঝবার ও কাজ করার ক্ষমতা দান করেছেন। তিনি সব কিছু দেখেন, তিনি আমাদের অন্তরের খবরও জানেন। শেষ বিচারের দিনে তাঁর কাছে ভালমন্দ কাজের জবাবদিহি করতে হবে। ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে। যার মধ্যে এ অনুভূতি আছে সে আল্লাহর ভয়ে পাপকর্ম থেকে দূরে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَا ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۝

অর্থ : “যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করে নিজেকে যাবতীয় পাপ থেকে বিরত রাখে, তার স্থান জান্নাতে।” (সূরা আননাযিআত : ৪০-৪১)

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে যে কেউ বাহ্যিকভাবে চরিত্রবান বলে অভিহিত হতে পারে। কিন্তু অন্তরে তাকওয়া না থাকলে সত্যিকারভাবে সদগুণাবলীর অধিকারী হতে পারে না। তাকওয়াভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা ও মহানবী (স)-এর আদর্শ অনুসারে যে সদগুণাবলী তাই ইসলামী আখলাক বা সত্যিকার সচরিত্র।

গুরুত্ব

ইসলামী জীবন দর্শনে তাকওয়াই সব সদগুণের মূল। তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানুষের চরিত্র গঠনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ সব কিছু জানেন, শোনে ও দেখেন, তিনি মানুষের অন্তরের গোপন খবরও জানেন, তাঁর কাছে মন্দ কাজের জবাবদিহি করতে হবে, সে ব্যক্তি কোন রকম পাপ চিন্তা করতে বা পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ সে জানে যে, অন্য সবাইকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহ তাআলাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে মুমিনের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান, সে কোন অবস্থাতেই প্রলোভনে পড়বে না এবং নির্জন স্থানেও পাপকর্মে লিপ্ত হবে না। চরিত্র গঠনে তাকওয়া একটি সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ। যার অন্তরে তাকওয়া আছে সে সর্বত্রই আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে। সে পাপ করতে পারে না। সুতরাং তাকওয়া হল সৎকর্মশীল জীবনযাপনের মূল কথা।

পক্ষান্তরে যার মধ্যে তাকওয়া নেই, সে নিষ্ঠাবান ও সৎকর্মশীল হতে পারে না। তার সব কাজকর্মই হয় লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। অন্তরে তাকওয়া না থাকলে মানুষ যে কোন দুর্বল মুহূর্তে পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে। আল্লাহর কাছে তাকওয়ার মূল্য সর্বাধিক।

আল্লাহ বলেন- **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ**

অর্থ : “তোমাদের মধ্যে যার সবচেয়ে বেশি তাকওয়া আছে সে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত।” (আল-হুজুরাত : ১৩)

এ পাঠে আমরা জানলাম-

১. আখলাকের পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রকার।
২. তাকওয়ার পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রভাব।

ইসলামের শিক্ষানুযায়ী আমরা আমাদের চরিত্র সুন্দর করে গড়ে তোলব। সব কাজকর্মে তাকওয়া অবলম্বন করে চলব।

সত্যবাদিতা (الصِّدْقُ)

পরিচয়

তাকওয়া থেকে উৎসারিত গুণাবলীর অন্যতম হচ্ছে সত্যবাদিতা। এক জন মুত্তাকীর মধ্যে যেসব গুণের সমাবেশ ঘটে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান গুণ হল সত্যবাদিতা। সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ সিদ্ক। বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করাকে সত্যবাদিতা বলে। আর যে ব্যক্তি সত্য বলে তাকে সাদিক বা সত্যবাদী বলে। আর প্রকৃতপক্ষে যা নয় তা প্রকাশ বা প্রমাণ করাকে মিথ্যা বলে। মিথ্যার আরবি প্রতিশব্দ হল কিয্ব। আর মিথ্যাবাদীকে বলে কাযিব।

পানি হিফায়ত ও সংরক্ষণ করা এবং পাক ও বিশুদ্ধ রাখার ব্যাপারেও ইসলামে জোর তাকীদ রয়েছে। মহানবী (স) বলেন, “আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক পদার্থের ওপর “রহমত” শব্দটি অঙ্কিত করে দিয়েছেন যাতে আমরা সদয় ব্যবহার করি।”

সৃষ্টিকুলের সাথে আমরা সদয় ব্যবহার করব। আমাদের কল্যাণের জন্য দ্বীনী দায়িত্ব পালনার্থে এদের সংরক্ষণ করব।

স্বদেশপ্রেম

পরিচয়

স্বদেশ বলতে আমরা সেই দেশকেই বুঝি, যে দেশে আমরা জন্মেছি, যেখানে আমরা বড় হয়েছি, যে স্থানের আলো বাতাসে আমরা বেঁচে আছি, যে দেশে ফল-ফসল, খাদ্য, পানি আমাদের দেহের পুষ্টি যোগাচ্ছে। এমন স্থানকে আমরা জন্মভূমি বা মাতৃভূমি বলে থাকি।

এ মাতৃভূমির জন্য মানুষের ভালবাসা সহজাত ও স্বভাবজাত। এ স্থানের জন্য মায়া এবং মমতা অন্তর থেকে উৎসারিত। বড় হয়ে মানুষ অন্য কোথাও চলে যেতে বাধ্য হলেও এ মায়া ভুলতে পারে না। জন্মভূমির প্রতি, মাতৃভূমির প্রতি, শৈশবের লীলাভূমির প্রতি মানুষের এ আকর্ষণ বা ভালবাসাকেই বলে ‘স্বদেশপ্রেম’। স্বদেশের মাটি, আলো-বাতাস, আবহাওয়া, আকাশ, ঋতু-বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের মনকে আনন্দিত করে ও আচ্ছন্ন রাখে।

এ স্বদেশপ্রেম আম্বিয়া (আ), আউলিয়া এবং মনীষীগণেরও ছিল। আমাদের প্রিয় নবী (স) কাফিরদের অত্যাচারে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাওয়ার সময় তিনি বার বার মক্কার দিকে, কা’বার দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। আর আফসোস করে বলছিলেন : “ হে আমার স্বদেশ! তুমি কত সুন্দর। আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার আপন গোত্রীয় লোকেরা যদি ষড়যন্ত্র না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।”

গুরুত্ব

স্বদেশের প্রতি মায়ামমতা ঈমানের অঙ্গ। বলা হয়েছে : **حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ** -

অর্থ : “স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।”

হাদীসে আছে- “যারা দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে সীমান্ত পাহারায় বিন্দ্র রজনী কাটায় তাদের জন্য জান্নাত।” যারা দেশকে ভালবাসে না তারা চরম অকৃতজ্ঞ। আর যারা অকৃতজ্ঞ তারা ধার্মিক নয়। তারা দেশদ্রোহী ও জঘন্য চরিত্রের লোক। দেশকে হিফায়ত না করতে পারলে ধর্মকে হিফায়ত করা যায় না, দেশের মানুষকে রক্ষা করা যায় না, তাদের স্বার্থ রক্ষা করা যায় না।

উপায়

দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম প্রমাণিত হয়। দেশকে ভালবাসতে হলে দেশের জন্য কাজ করতে হয়। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ত্যাগস্বীকার করতে হয়। দেশের উন্নতিতে অবদান রাখতে হয়। দেশকে ভালবাসার পূর্বশর্ত হচ্ছে, দেশের মানুষকে ভালবাসা। দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করাই সত্যিকার স্বদেশপ্রেম। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জিহাদ করা যেমন মুমিনের কর্তব্য, তেমনি দেশের শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করা ও ত্যাগস্বীকার করা সত্যিকার স্বদেশ প্রেমিকের কর্তব্য। এক কথায় স্বদেশপ্রেম দেশের মানুষের সেবার মধ্যে নিহিত। স্বদেশপ্রেম একটি মহৎ গুণ।

প্রতিজ্ঞা

আমরা শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানে-গুণে নিজেদের সুন্দর ও সুযোগ্য করে গড়ে তোলব। আমাদের দেশকে জানব। সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা সুন্দর আমাদের দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসব। দেশের কল্যাণকে নিজেদের কল্যাণ মনে করব।

দেশকে গড়ে তোলার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করব। দেশের শত্রু- চোরচালানি, কালোবাজারি, দেশে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টিকারী এবং দেশের স্বার্থ বিরোধীদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে বুখে দাঁড়াব।

এ পাঠে আমরা জানলাম-

১. অসহায় ও দুস্থদের সেবা, এর গুরুত্ব, মহানবী (স)-এর আদর্শ ও সেবা না করার পরিণতি।
২. খিদমতে খাল্ক-এর গুরুত্ব, আদর্শ কাহিনী, সেবা না করার পরিণতি, গাছপালা, উদ্ভিদ ও পরিবেশ সংরক্ষণে মানুষের দায়িত্ব।
৩. স্বদেশপ্রেম-এর পরিচয়, গুরুত্ব, উপায় ও প্রতিজ্ঞা।

হালাল উপার্জন

পরিচয়

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ পাক মানুষকে যেমন সুন্দর আকৃতি বা দৈহিক সৌন্দর্য দিয়েছেন, তেমনি তাকে উন্নত বিবেক, বুদ্ধি ও আত্মদান করেছেন। দেহ সুস্থ রাখার জন্য জীবিকার প্রয়োজন। আর আত্মার কল্যাণের জন্য হালাল জীবিকার জন্য হালাল উপার্জন অপরিহার্য। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন : (البقرة) : كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

অর্থ : “তোমরা উত্তম ও পবিত্র বস্তু খাও, যা আমি তোমাদের জীবিকারূপে দান করেছি।” (সূরা আল-বাকারা : ১৭৭)

হালাল উপার্জন মানে বৈধ উপার্জন। আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশিত ও অনুমোদিত পন্থায় যে আয় উপার্জন করা হয় তাকে বলে হালাল উপার্জন।

গুরুত্ব

হালাল উপার্জনে মানুষের কল্যাণ নিহিত। হারাম উপার্জনে রয়েছে অকল্যাণ। আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য আর অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। আল্লাহর ইবাদাত করা যেমন মানুষের কর্তব্য, তেমনি হালাল উপার্জন বা হালাল বুযি অন্বেষণ করাও মানুষের একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

অর্থ : “সালাত সমাপ্ত হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর।” (সূরা আল-জুমুআ : ১০)

মহানবী (স) বলেন- طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

অর্থ : “হালাল বুযি অন্বেষণ করা ফরযের পরেও একটি ফরয।”

ইসলাম অলসতা, কর্মবিমুখতা ও কুঁড়েমি আদৌ পছন্দ করে না। নিচের হাদীসটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। মহানবী (স) বলেছেন- “তোমাদের ফজরের সালাত আদায় শেষ হয়ে গেলে, বুযির অনুসন্ধান না করে ঘুমিয়ে পড়বে না।”

হযরত উমার (রা) বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন জীবিকার্জনের চেষ্টায় নিবুৎসাহী হয়ে বসে না থাকে।”

কায়িক শ্রমের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন-

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ (بخاری)

অর্থ : “দুই হাতের উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কোন দিন খায় নি।” (বুখারী)

হালাল উপার্জন যেমন কায়িকশ্রম দ্বারা হতে পারে, তেমনি তা চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমেও হতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে মহানবী (স) বলেছেন- “তোমাদের জীবিকার দশ ভাগের নয় ভাগই আছে ব্যবসার মধ্যে।”

ব্যবসা-বাণিজ্য সৎভাবে করতে হবে। এ মর্মে মহানবী (স) বলেন- “সৎ, বিশৃঙ্খল, মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে থাকবেন।”

চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও হালাল উপার্জনের আরও অনেক উপায় আছে। পশুপালন, হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্যচাষ, বৃক্ষরোপণ, ছোট-বড় মাঝারি ধরনের নার্সারি, কুটির শিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান ও হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা করা যায়। এতে যেমন আত্মকর্মসংস্থান ও হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা হয়, তেমনি দেশেরও উন্নতি হয়।

হারাম উপার্জনের কুফল

হারাম উপার্জন হালাল উপার্জনের বিপরীত। ন্যায় নীতিহীন ও মানবতাবিরোধী এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর পন্থায় আয় উপার্জনকে হারাম উপার্জন বলে। প্রতারণা, ছল-চাতুরি, দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া, ওজনে কম-বেশি করা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সুদ, ঘুষ এসবই হারাম।

অন্যায় ও অবৈধভাবে কিছু হাসিল করার জন্য কাউকে অবৈধভাবে কিছু দেওয়াকে ঘুষ বা উৎকোচ বলে। ঘুষ অবৈধ ও অন্যায় উপার্জন। তাই ইসলামে ঘুষ হারাম করা হয়েছে। মহানবী (স) বলেন-

الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي كِلَاهُمَا فِي النَّارِ অর্থ : “ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী।”

আর এক হাদীসে আছে- রাসূলুল্লাহ (স) ‘ঘুষদাতা, ঘুষগ্রহীতা এবং এর লেনদেনের দালালদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। সুদ, ঘুষ, প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জন শয়তানি কাজ। আল্লাহ পাক বলেন- “হে মানব সম্প্রদায়। দুনিয়ায় যা কিছু আছে তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু গ্রহণ কর, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”

হারাম উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করলে তার ইবাদাত কবুল হয় না।

মহানবী (স) বলেছেন - كُلُّ لَحْمٍ نَبَتٍ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

অর্থ : “হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট যে মাংস, নরকাগ্নিই তার উত্তম স্থান।”

এ পাঠে আমরা জানলাম-

১. হালাল উপার্জন-এর পরিচয়, গুরুত্ব, হারাম উপার্জনের কুফল।

আমরা হালাল উপার্জনে উৎসাহী হব ও হারাম থেকে বিরত থাকব।

বন্ধু নির্বাচন

বন্ধুর প্রয়োজন

মানুষ সামাজিক জীব। সে একাকী বাস করতে পারে না। আসলে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিই এমন যে, কোন মানুষ একাকী থাকতে চায় না। হযরত আদম (আ) জান্নাতের অফুরন্ত সুখ-শান্তির মধ্যেও একাকীত্বের কারণে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য তাঁর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সুতরাং দেখা গেল যে, কোন সঙ্গী-সাথী বা বন্ধু ছাড়া মানবজীবন অচল।

বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা

পার্থিব জীবনে কোন মানুষই বন্ধুর সাহচর্য বা প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। মহানবী (স) বলেছেন-

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ (احمد و ترمذی)

অর্থ : “মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম (স্বভাব চরিত্র) দ্বারা প্রভাবিত, সুতরাং সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে তা যেন যাচাই করে নেয়।”

অর্থাৎ এক বন্ধুর প্রভাব অন্য বন্ধুর ওপর পড়ে। সুতরাং স্বভাব-চরিত্র দেখে বন্ধুত্ব করতে হবে। অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা ও সৎ বন্ধুর সাহচর্যে মানুষ মর্যাদার উচ্চাসন অর্জন করতে পারে। পক্ষান্তরে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতা এবং অসৎ বন্ধুর সংস্পর্শে সে মহাধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে পারে। কার সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে এবং কার সঙ্গে চলতে হবে, এ ব্যাপারে পথ নির্দেশ করে মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. (তوبه : ১১৭)

অর্থ : “হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।” (সূরা তাওবা : ১১৭)।

সৎ লোকের সাথে চললে সৎ হওয়া যায়। আর অসৎ লোকের সাথে চললে অসৎ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কথায় বলে- সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। মহানবী (স) বলেছেন- “অসৎ সঙ্গীর চেয়ে একাকীত্ব ভাল। আর একাকীত্বের চেয়ে সৎ সঙ্গী ভাল।”

সৎ বন্ধুর গুণাবলি

মহাত্মা ইমাম গাযালী (র) বলেছেন : “যার সাথে বন্ধুত্ব করবে তার মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকা চাই। বুদ্ধিমত্তা, সৎস্বভাব, পাপাচারী না হওয়া, বিদআতী না হওয়া, দুনিয়াসক্ত না হওয়া।”

১. বুদ্ধিমত্তা : নির্বোধ লোকের বন্ধুত্বে কোন কল্যাণ নেই। প্রবাদ আছে “নির্বোধ বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রুও ভাল।”
 ২. সৎ স্বভাব : যার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়, তার সাথে বন্ধুত্বে কোন মজল নেই। বন্ধুর স্বভাব-চরিত্র অন্য বন্ধুর ওপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে। তাই সৎ স্বভাব দেখে বন্ধু নির্বাচন করা দরকার।
 ৩. পাপাচারী না হওয়া : যে ব্যক্তি আল্লাহ পাককে ভয় করে না, তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হওয়া যায় না। তার কথায় বিশ্বাস করা যায় না। তাই বন্ধু নির্বাচনে পাপাচারী না হওয়া উচিত।
 ৪. বিদআতী না হওয়া : বিদআত মানে কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী খারাপ কাজ। যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী কাজে লিপ্ত, তাকে ত্যাগ করা কর্তব্য। কারণ তার ঐ বিদআত অন্য বন্ধুর মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে।
 ৫. দুনিয়াসক্ত না হওয়া : যে ব্যক্তি পরকালের ওপর ইহকালের অগ্রাধিকার দেয়, সে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে পাপ কর্মে লিপ্ত থাকে, তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে কল্যাণ হতে পারে না।
- বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক করে হযরত জাফর সাদিক (র) বলেছেন- পাঁচ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করবে না :

১. মিথ্যাবাদী - কারণ তার কাছে প্রবঞ্চনা আর প্রতারণাই পাওয়া যাবে।
২. নির্বোধ - তার থেকে কোন উপকার আশা করা যায় না, বরং অপকারই পাবে।
৩. ভীষু - সে তোমাকে বিপদের সময় শত্রুর হাতে সমর্পণ করবে।
৪. পাপাচারী - সে তোমাকে এক লোকমার বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলবে।
৫. কৃপণ - সে একান্ত প্রয়োজনের সময় তোমাকে ত্যাগ করবে।

কে প্রকৃত বন্ধু তা চেনা খুব কঠিন। অনেক সময় পরম শত্রুও বন্ধুবেশে এসে ভীষণ সর্বনাশ করে। ইবলিস শয়তানও আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর কাছে বন্ধুবেশে এসেছিল এবং তাঁদের ভীষণ ক্ষতি করেছিল।

এ পাঠে আমরা জানলাম-

১. বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা।
২. বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতার গুরুত্ব।
৩. সৎ বন্ধুর গুণাবলি।
৪. কার কার সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না।

আমরা বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হব, সৎ বন্ধু নির্বাচন করে দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তির পথ সুগম করব।

পরিচ্ছন্নতা

পরিচয়

পরিষ্কার, পরিপাটি, নির্মল অবস্থানকে বলে পরিচ্ছন্নতা। আর বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জিত দেহ, মন, পোশাক ও স্থান বা পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতাকে বলে তাহায়াত বা পবিত্রতা।

গুরুত্ব

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত সালাত আদায় করার জন্য শরীর, পোশাক ও স্থান তথা পরিবেশ পবিত্র হওয়া অপরিহার্য। পরিচ্ছন্নতা বা পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন। যারা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকে সবাই তাদের ভালবাসে। আল্লাহ পাকও তাদের ভালবাসেন। কুরআন মাজীদে আছে-

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. অর্থাৎ “যারা পবিত্র থাকে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।”

আমরা নানারকম কাজ করি। আমাদের হাত, পা, শরীর ও কাপড় ময়লা হয়, ধুলা-বালি লাগে। ঘামে শরীর ভিজে যায়, দুর্গন্ধ হয়। লোকে ঘৃণা করে। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই, দাঁতে ময়লা লাগে। দাঁত মুখ পরিষ্কার না করলে মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে। লোকে অপছন্দ করে, অকালে দাঁত পড়ে যায়। দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্য ওয়ু করার আগে দাঁত মাজতে হয়, মেসওয়াক করতে হয়। মহানবী (স) বলেছেন- “আমার উম্মাতের কষ্ট না হলে, প্রত্যেক ওয়ুর আগে মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।” অনেকের নখ, চুল বড় হয়। দেখতে খারাপ লাগে। নখ বড় হলে নখে নানারকম ময়লা জমে, তা খাবারের সাথে পেটে যায় এবং পেটের অসুখ হয়। নখ কেটে ছোট ও পরিষ্কার রাখতে হবে। চুল ঠিক করে রাখতে হবে। মহানবী (স) এক বার একটি লোককে এলোমেলো চুল দেখে বললেন- “এ ব্যক্তি কি চুল ঠিক করার কিছুই পেল না?” অনেকে পায়খানা প্রস্রাব করে ভালভাবে পরিষ্কার হয় না। শরীর ময়লা, নোংরা থাকলে নানারকম রোগ হয়। পায়খানা প্রস্রাবের পর ভালভাবে পরিষ্কার হতে হবে। দিনে এক বার গোসল এবং পাঁচ বার ওয়ু করার মাধ্যমে দেহ পরিচ্ছন্ন হয়, পবিত্র হয়। মন ভাল থাকে, ফুটি লাগে। কাজকর্মে উৎসাহ আসে।

পোশাক

আমরা নানাবিধের কাজকর্ম করি। আমাদের কাপড়-চোপড় ময়লা হয়। ময়লা কাপড়-চোপড় পরলে শরীর খারাপ হয়। নানারকম রোগ হয়। মন ভাল লাগে না। লোকে ঘৃণা করে। পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ

পাক বলেন- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ “তোমার কাপড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখ।” (সূরা আল-মুদাস্সির : ৪)

মহানবী (স) সবসময় পরিষ্কার কাপড় পরতেন। শরীর পরিষ্কার রাখার মতই কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। অপবিত্র শরীরে যেমন সালাত আদায় করা যায় না, তেমনি অপবিত্র পোশাকেও সালাত আদায় করা যায় না।

মহানবী (স) সবসময় পরিষ্কার কাপড় পরতেন। শরীর পরিষ্কার রাখার মতই কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। অপবিত্র শরীরে যেমন সালাত আদায় করা যায় না, তেমনি অপবিত্র পোশাকেও সালাত আদায় করা যায় না।

পরিবেশ

আমরা শ্রেণীকক্ষ, বিদ্যালয়, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ ইত্যাদি নোংরা রাখি, অপরিচ্ছন্ন রাখি। যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলি। কফ-থুথু ফেলি, মলমূত্র ত্যাগ করি। এতে আমাদের পরিবেশ নোংরা হয়, নষ্ট হয়। নোংরা পরিবেশ রোগ-ব্যাধির আধার। রোগ-ব্যাধি ছড়ায়। আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শরীর ও পোশাকের মত জায়গা বা পরিবেশও পবিত্র হওয়া একান্ত অপরিহার্য। পরিবেশ পরিষ্কার না থাকলে শরীর ও পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখা যায় না। আমাদের রাস্তাঘাট, যানবাহন, বাস স্টেশন, রেল স্টেশন, ফেরিঘাট ইত্যাদি জনাকীর্ণ স্থানগুলো এত নোংরা থাকে যে, ভাবতেও অবাক লাগে। যে কোন মুহূর্তে শরীর ও পোশাক নোংরা হয়ে যেতে পারে। সেখান থেকে

প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হলে আমরা অনেক রোগ-ব্যাদি থেকে রেহাই পেতে পারি। পানি আমাদের পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শরীর ও পোশাক পাকসাঁফ করার জন্য পাক পানি অপরিহার্য। পানি যাতে দূষিত ও অপবিত্র না হয় সেদিকে আমাদের সবার দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। যে পানি দ্বারা মানুষ পাকসাঁফ হয়, যে পানি মানুষ পান করে, আমরা অনেক সময় সেই পানিতেই ময়লা-আবর্জনা ফেলি, মলমূত্র ত্যাগ করি। এটা যে কত বড় অন্যায় ও ক্ষতিকর তা কি আমরা ভেবে দেখি? এখন থেকে আমরা আমাদের শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পাক-সাঁফ, পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে চেষ্টা করব। পবিত্র পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করব না। ময়লা-আবর্জনা ফেলব না।

এ পাঠে আমরা জানলাম—

১. পরিচ্ছন্নতার পরিচয়।
২. পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব।
৩. শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা।
৪. পরিবেশ পরিচ্ছন্ন না রাখার কুফল।
৫. পানি পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ না রাখার কুফল।

আখলাকে যামীমাহ্

নিচে আখলাকে যামীমাহ্ বা নিন্দনীয় আচরণ ও দুষ্টরিত্র সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করা হল।

প্রতারণা

পরিচয়

প্রতারণা মানে ঠিকানা বা ফাঁকি দেওয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ভেজাল দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, মাপে-ওযনে কম দেওয়া, বেশি দামের জিনিসের সাথে কম দামের জিনিস মিশিয়ে দেওয়া, গাভী বিক্রির আগে স্তনে দুধ আটকে রাখা, মিথ্যা হলফ করে অন্যের হক নষ্ট করা— এসবই প্রতারণার শামিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও মানুষ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কাজেও প্রতারণা করে থাকে।

প্রতারণা বর্জনের গুরুত্ব

প্রতারণা ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতা বিরোধী অতি গর্হিত কাজ। প্রতারণা মিথ্যারই শামিল। মিথ্যা যেমন ঘৃণ্য, প্রতারণাও তেমনি ঘৃণ্য। এটি একটি সমাজদ্রোহী পাপ। এ সম্বন্ধে মহানবী (স) বলেন— **مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا** অর্থাৎ “যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের (মুসলমানদের) সমাজভুক্ত নয়।”

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট নীতি ও বিধান রয়েছে। ইসলাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে, জীবনে যা কিছু করবে তার মধ্যে ফাঁকি ও প্রতারণার স্থান নেই। ইসলাম সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণকে কোনমতেই সমর্থন করে না। কুরআন মাজীদে ঘোষণা করা হয়েছে— **وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ**।

অর্থ : “তোমরা সত্যের সাথে অসত্যের মিশ্রণ ঘটায়ো না এবং তোমরা জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না।” (বাকার : ৪২)

পণ্যের দোষ গোপন করা সম্বন্ধে রাসূল (স)-এর উক্তি হচ্ছে, “যে দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে, ক্রেতাকে দোষের কথা জানায় না, এমন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর রোষের মধ্যে থাকবে এবং ফেরেশতারা সর্বদা তাকে অভিশাপ দিতে থাকবে।” ক্রেতা দেখে শুনে কিনেছে আমার কী দোষ, এমন কথায় সে পরিত্রাণ পাবে না। কারণ পরিস্কার ভাষায় পণ্যের দোষটুকি জানিয়ে দেওয়া বিক্রতার কর্তব্য ছিল। সে পণ্যের দোষ গোপন করে আল্লাহ পাকের অবিরাম রোষ এবং ফেরেশতাদের অবিরাম লা'নত কুড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রতারণা দ্বারা অর্জিত জীবিকা হারাম। আর যে দেহ হারাম বুজি দ্বারা পরিপুষ্ট

তার স্থান জাহান্নামে। পক্ষান্তরে সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করলে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। জান্নাতে সম্মানের স্থান পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে মহানবী (স) বলেন-

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ : “বিশুস্ত সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে থাকবেন”। পক্ষান্তরে প্রতারণা করা মুনাফিকদের স্বভাব। আর মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে। প্রতারণাকারীর প্রতি যেমন আল্লাহর অভিশাপ, তেমনি সমাজেও তার কোন সম্মানের স্থান নেই। তাকে কেউ বিশ্বাস করে না, ভালবাসে না।

প্রতারণা তাকওয়াপূর্ণ ইসলামী জীবনযাপনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মুতাকী ব্যক্তি কোন সময়ই প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে না। আমরাও সবরকম প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়ে তাকওয়াপূর্ণ জীবনযাপনে ব্রতী হব।

গীবত (الْغَيْبَةُ)

পরিচয়

আমরা পরের দোষ বলে বেড়াই। অসাক্ষাতে দুর্নাম করি, গীবত করি। অসাক্ষাতে কারও দোষ বলাকে ‘গীবত’ বলে। অর্থাৎ কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের কাছে তাঁর এমন কোন দোষের কথা বলা, যা সে শুনলে মনে কষ্ট পাবে।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে সুখ-শান্তিতে মিলেমিশে বাস করতে হলে আমাদের মধ্যে কতগুলো ভাল গুণ, যেমন- পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সহানুভূতি, উদারতা ইত্যাদি থাকা দরকার। গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি নিন্দনীয় আচরণগুলো আমাদের সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা মারাত্মকভাবে বিনষ্ট ও ধ্বংস করে।

তাৎপর্য

আমরা অনেক সময় অলসভাবে বসে থাকি। হাতে কোন কাজ থাকে না। তাই অযথা অন্যের সমালোচনা করি। পরনিন্দা ও পরচর্চা করি। যারা ভাল মানুষ তারা অন্যের গুণ প্রকাশ করে, দোষ বলে না। আর যারা নিজেরা খারাপ তারা অন্যদেরও খারাপ মনে করে। তারা মানুষের গুণ দেখে না, দোষ খুঁজে বেড়ায়। আর কুৎসা রটনা করে।

কুফল : ইসলামী শরীআতে গীবত করা হারাম। গীবত সামাজিক সুখ-শান্তি বিনষ্ট করে। আপন মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা যেমন জঘন্য, গীবত করাও তেমনি জঘন্য ও ঘৃণার কাজ। এ সম্বন্ধে আল্লাহ পাক বলেছেন-

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ (الحجرات : ১২)

অর্থ : “তোমরা একে অন্যের গীবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালবাসে? না, তোমরা তা অপছন্দ কর।” (আল-হুজুরাত : ১২)

পরনিন্দা

পরিচয়

কারও দোষ বলে বেড়ানো, কুৎসা রটানো, গীবত করা এসবই পরনিন্দা। পরনিন্দা মানে অন্যের নিন্দাবাদ করা, অন্যের দোষ বলা। পরনিন্দায় পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। সমাজের শান্তি নষ্ট হয়। যে পরনিন্দা করে তাকে কেউ বিশ্বাস করে না ও ভালবাসে না। এক জনের দুর্নাম অন্যের কাছে বললে পরস্পরের সম্পর্ক নষ্ট হয়, বিবাদ সৃষ্টি হয়। পরনিন্দা যেমন সমাজে ঘৃণিত কাজ; তেমনি তা আল্লাহর কাছেও জঘন্য পাপের কাজ। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ কঠোর নিষেধবাণী প্রদান করে বলেন-

وَلَا تَجَسَّسُوا . অর্থাৎ “তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না।”

পরিনিদার পরিণতি সম্বন্ধে মহানবী (স) বলেন- “পরিনিদাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (বুখারী ও মুসলিম)

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেন, “তোমরা অন্যের দোষ অবৈধ করে না, গুস্তচরবৃত্তি করবে না, পরস্পরে কলহ করবে না, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না, একে অপরকে ঘৃণা করবে না, অন্যের ক্ষতিসাধনের কোন কৌশল অবলম্বন করবে না। তোমরা মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।” (বুখারী ও মুসলিম)।

এক দিন মহানবী (স) মিস্রের উঠে উচ্চস্বরে বললেন : “হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা মুখে ইসলাম কবুল করেছে; কিন্তু তাদের অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করেনি। তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিও না; তাদের নিন্দা করবে না এবং তাদের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করবে না। কারণ, যে তার মুসলিম ভাইয়ের ত্রুটি অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তার ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন, আর আল্লাহ যার ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন, তাকে তিনি অপমানিত করবেন। এমন কি সে তার নিজের ঘরের মধ্যে থাকলেও।”

হিংসা-বিদ্বেষ

আমরা সমাজে বাস করি। সমাজে একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও ভালবাসা সামাজিক জীবনকে শান্তিময় ও মধুময় করে তোলে। পক্ষান্তরে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ আমাদের জীবনকে বিষিয়ে তোলে। এতে আমাদের সামাজিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। মানব চরিত্রে যেসব খারাপ দিক আছে তার মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ মারাত্মক ক্ষতিকর। হিংসা-বিদ্বেষের সাথে অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, অন্যের অনিষ্ট কামনা ও শত্রুতা অজ্ঞাঙ্গিভাবে জড়িত। হিংসা-বিদ্বেষ মানে নিজেকে বড় মনে করে অন্যকে ঘৃণা করা, শত্রুতা পোষণ করা এবং অন্যের অনিষ্ট কামনা করা। হিংসুক ব্যক্তি অন্যের ভাল দেখতে পারে না। এ আচরণ ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মহানবী (স) বলেছেন : “পরস্পর সদিচ্ছা বা শুভকামনাই দ্বীন।” হিংসা বিদ্বেষকারী এ মহান বাণীর পরিপন্থী আচরণ করে দ্বীন ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করে। হিংসা-বিদ্বেষের মারাত্মক পরিণতি সম্বন্ধে সাবধান করে মহানবী (স) বলেন-

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (ابو داؤد)

অর্থ : “তোমরা হিংসা থেকে সাবধান থাক। কারণ আগুন যেমন শুকনো কাঠ খেয়ে ফেলে, হিংসাও তেমনি সৎকর্মগুলো খেয়ে ফেলে।” (আবু-দাউদ)

হিংসা-বিদ্বেষ দ্বীন ইসলামের জন্য যে মারাত্মক ক্ষতিকর তা রাসূল (স)-এর এ হাদীসটি থেকে উপলব্ধি করা যায়। মহানবী (স) বলেছেন, “তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মুডনকারী (ধ্বংসকারী) রোগ ঘৃণা ও হিংসা তোমাদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। আমি চুল মুডনের কথা বলছি না, বরং তা হল দ্বীনের মুডনকারী।” (আহমাদ ও তিরমিযী)

ফিৎনা-ফাসাদ

ইসলাম একটি শান্তিময় সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা। ইসলামে আছে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা। ইসলামে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা এবং কলহ-বিবাদের কোন স্থান নেই। ইসলামের প্রতিটি বিধি-বিধান ও আচার অনুষ্ঠানেই শৃঙ্খলার শিক্ষা নিহিত। জামাআতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইমামের পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হয়। রুকু-সিজদাহ, ওঠা-বসা প্রত্যেকটি কাজেই ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করতে হয়। এ থেকে আমরা নেতার নেতৃত্ব মেনে চলার শিক্ষা পাই। আল্লাহ পাকের সৃষ্টির কোথাও বিশৃঙ্খলার স্থান নেই। প্রকৃতির নিয়মের রাজত্বে এক অমোঘ শৃঙ্খলা বিদ্যমান। আমাদেরও জীবনের সর্বস্তরে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন। মহান

আল্লাহ বলেন- لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (اعراف: ৫২)

অর্থ : “শৃঙ্খলাপূর্ণ পৃথিবীতে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর না।” (সূরা আরাফ-৫২)

وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ - তিনি আরও বলেন-

অর্থ : “তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।” (আল-কাসাস : ৭৭)
ফিতনা-ফাসাদ আর বিশৃঙ্খলা যে কত জঘন্য কাজ তা আমরা কুরআন মাজীদে এই ছোট্ট আয়াত থেকে বুঝতে পারি।

আল্লাহ পাক বলেছেন : **الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ**

অর্থ : “ফিতনা-ফাসাদ হত্যার চেয়েও জঘন্য।” (সূরা আল-বাকার : ১৯১)

আদর্শ কাহিনী

নিয়মশৃঙ্খলার ওপর একটি জাতির উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে। উহূদের যুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে মুসলিমদের চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। রাসূল (স) উহূদ গিরিপথে আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর (রা)-এর নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন তীরন্দাযের একটি বাহিনী নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিল “কোন অবস্থায়ই তাঁরা গিরিপথ অরক্ষিত রেখে চলে আসবে না”। কিন্তু বিজয় অর্জিত হয়েছে ভেবে তীরন্দাযগণ গিরিপথ ছেড়ে চলে আসলেন। নেতার নিষেধ মানলেন না। কাফির সেনাপতি গিরিপথ অরক্ষিত দেখে পেছন থেকে আক্রমণ করল। পলায়নরত কাফিরাও ঘুরে দাঁড়াল। এতে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হননি, তবে তাঁদের সাময়িক বিপর্যয় এসেছিল এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। অনেক সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন।

আমরা আমাদের কল্যাণের জন্য সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে সব রকমের ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি থেকে নিজেদের বিরত রাখব এবং অন্যদেরও বিরত রাখব। সমাজে কলহ-বিবাদ হলে তা মীমাংসা করে দেব। সব রকমের নাশকতামূলক সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াব।

এ পাঠে আমরা জানলাম-

১. গীবত-এর পরিচয়, তাৎপর্য ও কুফল।
২. পরনিন্দার পরিচয় ও বর্জনের গুরুত্ব।
৩. হিংসা-বিদ্বেষের পরিচয় ও পরিণতি।
৪. ফিতনা-ফাসাদ বর্জনের গুরুত্ব।
৫. আদর্শ কাহিনী।
৬. প্রতারণার পরিচয় ও তা বর্জনের গুরুত্ব।

আমরা এ দোষগুলো থেকে আমাদের মুক্ত রাখব। সুন্দর সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে তোলব।

ধূমপান ও মাদকাসক্তি

মানুষকে আল্লাহ তাআলা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর তার জন্য সুন্দর জীবনযাপনের যাবতীয় উপায় উপকরণ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষের জন্য যা কল্যাণকর, পবিত্র, উত্তম ও উপাদেয় তা তিনি হালাল করে দিয়েছেন। আর যা অপবিত্র, অনুপাদেয়, অকল্যাণকর তা হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেছেন-

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (طه : ৮১)

অর্থ : “পবিত্র বস্তু থেকে তোমাদের যা জীবিকা হিসেবে দিয়েছি, তোমরা তা আহা কর।” (সূরা তাহা : ৮১)

মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তা গ্রহণীয়, আর যা অকল্যাণকর তা বর্জনীয়। গ্রহণ ও বর্জন সম্বন্ধে আল্লাহ পাক ও রাসূল (স)-এর সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও কিছু লোক সর্বনাশা বর্জনীয় জিনিসের ফাঁদে পড়ে নিজেদের, পরিবারের ও সমাজের সর্বনাশ ডেকে আনে। মারাত্মক বদভ্যাসের দাসে পরিণত হয়। ধূমপান ও মাদকাসক্তি এ ধরনের মারাত্মক বদভ্যাস।

ধূমপান

ইসলামের দৃষ্টিতে সব ধরনের ধূমপান অপরাধ। ধূমপান অনর্থক অপব্যয়। ইসলামে সবরকম অপব্যয় ও অপচয় অবশ্য বর্জনীয়। অপব্যয়ীদের আল্লাহ পাক শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন—

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ অর্থঃ “ নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।” (বনী ইসরাঈল : ২৭)

ধূমপান শুধু অপব্যয় নয়, মারাত্মক ক্ষতিকরও। সিগারেট, চুরুট, বিড়ি, হুঁক্কা ইত্যাদির পোড়া তামাকের উগ্রগন্ধ যে কত বিরক্তিকর তা অধূমপায়ী মাত্রই অনুধাবন করতে পারেন। দুর্গন্ধ নিয়ে আল্লাহ পাকের ইবাদাত করা নিষিদ্ধ। মহানবী (স) বলেন, “ যে ব্যক্তি দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য খায়, সে যেন (ঐ অবস্থায়) মসজিদের নিকটবর্তীও না হয়।” সুতরাং ধূমপান আল্লাহ পাকের ইবাদাত কবুল হওয়ার অন্তরায়। ধূমপায়ীর মুখের দুর্গন্ধে অন্য মুসল্লীদের কষ্ট হয়।

ধূমপায়ীরা ধূমপানজনিত অপব্যয় পুঁথিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক সময় অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য হয়। ধূমপান মানুষকে এভাবে পাপকর্মে লিপ্ত করে। ধূমপানের বদভ্যাস মানুষকে আসক্ত করে। আর সব ধরনের আসক্তিই হারাম।

মহানবী (স) বলেন- كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَمٌ অর্থঃ “যাবতীয় নেশার বস্তু হারাম।”

ধূমপানের আসক্তি নিজের পরিবারের ও সমাজের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে।

একখণ্ড পরিচ্ছন্ন কাগজে মোড়া সিগারেট আকর্ষণীয় হলেও আসলে তা উগ্র নিকোটিনের বিষে ভরা। নিকোটিন এত মারাত্মক যে, দুইটি সিগারেটে যে পরিমাণ নিকোটিন আছে, তা ইনজেকশন দ্বারা কোন সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করালে তার মৃত্যু অনিবার্য।

প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সীনা বলেছেন, “পৃথিবীর এত ধূলি, ঝোঁয়া ও গ্যাস যদি মানুষের ফুসফুসে না ঢুকত, তাহলে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে সুস্থ অবস্থায় জীবিত থাকত।”

বিশেষজ্ঞ মহলের মতে— “এক একটা জ্বলন্ত সিগারেট থেকে কম করে হলেও চার হাজার বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়।”

ধূমপানে যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাইটিস, দন্তক্ষয়, ক্ষুধামন্দা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ প্রভৃতি মারাত্মক রোগ হয়।

সিগারেট শুধু নিজে জ্বলে না, অন্যদেরও জ্বালায়। ধূমপান শুধু ধূমপায়ীর জন্যই বিপজ্জনক নয়, তার আশপাশের অধূমপায়ীদের জন্যও বিপজ্জনক। পুড়ে যাওয়া তামাকের বিরক্তিকর ও বিষী ঝোঁয়া বায়ু দূষিত করে, পানি দূষিত করে এবং গোটা পরিবেশকেই দূষিত করে। ধূমপায়ীর ঘরে অধূমপায়ী নারী, শিশু ও বৃদ্ধা থাকলে তারাও সমানভাবে নিঃশ্বাসের সাথে ধূমবিষ গ্রহণ করে। তাদের ফুসফুস ক্যান্সারের প্রবণতা স্বাভাবিকের চেয়ে তিন গুণ বেশি।

ধূমপানকে বিষপানের সমকক্ষ বললেই যথার্থ বলা হয় না বরং ধূমপান বিষপানের চেয়েও মারাত্মক। কারণ বিষপানে শুধু বিষপানকারীরই ক্ষতি হয়, আর ধূমপানে তার পরিবেশে অধূমপায়ী এমনকি ভবিষ্যৎ বংশধরেরও মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে।

প্রতিকারের উপায়

ইচ্ছাশক্তি : ধূমপান বর্জনের জন্য ধূমপায়ীর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। রমযান মাস মুসলিমদের ধূমপান বর্জনের উপযুক্ত সময়।

ইসলামের শিক্ষা : ইসলামের শিক্ষা ও বিধি-বিধান পুরোপুরি মেনে চললে ধূমপান বর্জন করা সহজ হয়।

সামাজিক প্রতিরোধ : ধূমপান নিবারণের জন্য সমাজ ও স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তিবর্গের সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। পরিবারের একান্ত আপন জন— ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, ও বৃদ্ধ পিতামাতার কল্যাণ কামনায় ধূমপান বর্জন করা উচিত।

প্রচার মাধ্যম : সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমগুলো ধূমপান প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

সচেতনতা বৃদ্ধি : ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলা আবশ্যিক।

চিকিৎসকদের উদ্যোগ : ধূমপান নিবারণে চিকিৎসকগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন।

মসজিদের ইমাম ও আলেমগণের ভূমিকা : মসজিদের ইমামসহ আলেম সমাজ ধূমপানের অপকারিতা সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করতে পারেন।

মাদকাসক্তি

মাদকাসক্তি হল— মাদকদ্রব্যের দ্বারা আসক্তি বা নেশা সৃষ্টি হওয়া। মাদকদ্রব্য কী তার পরিচয় দিয়ে মহানবী (স) বলেন— **الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ** অর্থাৎ “মাদকদ্রব্য তাই, যা জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে। যে কোন দ্রব্য যা নেশা সৃষ্টি করে, সুস্থ মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায় এবং জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি লোপ করে দেয়।”

এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেন— **كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ** অর্থাৎ “নেশা সৃষ্টিকারী যে কোন দ্রব্যই মদ। আর যাবতীয় মদ হারাম।” (মুসলিম)।

মাদকদ্রব্য প্রাকৃতিক হোক আর রাসায়নিক হোক, অল্প হোক, আর বেশি হোক, পান করা হোক, আহার করা হোক বা অন্য কোনভাবে গ্রহণ করা হোক, নেশা ও চিন্তাশ্রমকারী হলেই তা মাদকদ্রব্য এবং তাতে আসক্তিকেই মাদকসক্তি বলে।

মাদকদ্রব্য

মাদকদ্রব্যের মধ্যে আছে মদ, গাঁজা, তাড়ি, আফিম, চরস, হাশিশ, ভাং, মারিজুয়ানা, হেরোইন, মরফিন, পেথেড্রিন, ভেলিয়াম, সোনারিল, কোকেন, মেনড্রেকস, পলিটামিন, কোডেইন, ফেনসিডিল প্রভৃতি।

কুফল

মাদকদ্রব্যের মারাত্মক অপকারিতা এবং এর ব্যবহারকারীর কবুণ পরিণতির জন্য আল্লাহ পাক মাদকদ্রব্যগুলো দ্ব্যর্থহীনভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি মুমিনদের মাদকের কবল থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔

অর্থ : “অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা এবং লটারি অপবিত্র ও শয়তানের কাজ। অতএব, তোমরা তা থেকে দূরে থাকবে, যাতে সফলকাম হতে পার।।” (সূরা আল-মায়িদাহ : ৯০)

মাদকাসক্তির কুফল বা অপকারিতা

ধর্মীয় : এটি অপবিত্র ও শয়তানের কাজ, যা মানুষকে আল্লাহর রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না। মহানবী (স) বলেন— لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنٌ خَمْرٍ অর্থাৎ “মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ ব্যক্তির ওপর মহানবী (স) লানত করেছেন। যথা :

১. যে নির্যাস বের করে, ২. প্রস্তুতকারী, ৩. পানকারী (ব্যবহারকারী), ৪. যে পান করায়, ৫. আমদানিকারক, ৬. যার জন্য আমদানি করা হয়, ৭. বিক্রেতা, ৮. ক্রেতা, ৯. সরবরাহকারী, ১০. লভ্যাংশ ভোগকারী। (তিরমিযী)

দৈহিক : মাদকাসক্তি মানবদেহে মারাত্মক ক্ষতি করে। এতে হজম শক্তি নষ্ট হয়, খাবারে অরুচি হয়। দেহে ক্রমাগত অপুষ্টি বাসা বাঁধতে থাকে। স্থায়ী কফ, কাশি এবং মারাত্মক যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, মাদকের প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানের ওপরও পড়ে; সন্তান দুর্বল ও নির্বোধ হয়, লভার ও কিডনি নষ্ট হয়।

মানসিক : মাদকদ্রব্য গ্রহণে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। বোধশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। ভারসাম্য হারিয়ে যায়। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের মতে চৈতন্য ফিরে আসার পরও এর প্রভাব বিদ্যমান থাকে। এতে মানুষ পাগলও হয়ে যেতে পারে। মদ কখনও শরীরের অংশে পরিণত হয় না এবং এতে রক্তও সৃষ্টি হয় না। রক্তের মধ্যে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাত্র। হঠাৎ রক্তের এ উত্তেজনা অনেক সময় মৃত্যুরও কারণ হয়ে যায়। মাদকাসক্তির কারণে ঝগড়া-বিবাদ ও পারিবারিক বিরোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি মাদকাসক্ত হলে, তার দ্বারা দেশের প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত গোপন তথ্য শত্রুর হাতে চলে যেতে পারে।

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় : মাদকাসক্তি নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে। মানুষকে চিত্তবিভ্রম, অস্থির ও উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। ব্যভিচার ও নরহত্যার মত জঘন্য অপরাধগুলোর অধিকাংশই মাদকাসক্তির পরিণাম। যানবাহন দুর্ঘটনা

বেশির ভাগ মাদকাসক্ত চালকদের কারণেই ঘটে থাকে। মহানবী (স) বলেছেন : الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ وَالْفَوَاحِشِ অর্থাৎ “মাদকদ্রব্য সকল অপকর্ম ও অশ্লীলতার মূল।”

দেশের আশা-ভরসা ও মূল্যবান সম্পদ যুবশক্তিকে ধ্বংস করার এক মোক্ষম হাতিয়ার এ মাদকাসক্তি।

আর্থিক : মাদকাসক্তি মারাত্মক অপব্যয়। এক জন মাদকাসক্তের প্রতি দিন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ অপব্যয় পরিবার ও সমাজের জন্য অপরিসীম দুর্ভোগ বয়ে নিয়ে আসে। মাদকাসক্ত তার মাদকের ব্যয় সঙ্কুলানে বাধ্য হয়। নিজের পরিবার পরিজন থেকে শুরু করে সমাজের আর দশ জনের টাকা পয়সাও লুটেপুটে নিয়ে সমাজ জীবনকে পর্য়দস্ত করে তোলে। এ কাজ সর্বত্র ত্রাস, সন্ত্রাস ও অশান্তি সৃষ্টি করে।

প্রতিকারের উপায়

১. মাদকের প্রতিকার ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কঠোর আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। অবশ্য এ ব্যাপারে ইসলামে কঠোর আইন আছে। ২. মাদক বিরোধী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে এর প্রতিকার করা যায়। ৩. ইসলামের বিধি-বিধান অবহিত হয়ে তা যথাযথ মেনে চললে প্রতিকার সম্ভব। ৪. মাদকদ্রব্য প্রস্তুত, প্রচলন ও সরবরাহ কাজের সাথে যারা সরাসরি জড়িত তাদের জাতীয় স্বার্থে এ ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। ৫. মাতাপিতা, অভিভাবকদের কর্তব্য হবে নিজেদের সন্তানদের মাদকের ক্ষতি সম্বন্ধে ভালভাবে অবহিত করা, বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক করে তোলা, অসৎ সঙ্গীদের থেকে দূরে রাখা। সন্তানদের স্নেহ-মমতা দিয়ে কাছে রাখা। পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখা ৬. শিক্ষকগণ তাঁদের চরিত্র, আচরণ, আদেশ ও উপদেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাদকমুক্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। ৭. মসজিদের ইমাম ও আলেমগণ ওয়ায-নসিহত ও উপদেশ দানের মাধ্যমে এর অপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারেন। ৮. সমাজের নেতারা এবং স্বেচ্ছাসেবীরা এ ব্যাধি রোধে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। ৯. সরকার

কঠোর আইন প্রণয়ন ও শক্তভাবে প্রয়োগ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে এর প্রতিকার করতে পারেন। ১০. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আরও বেশি তৎপর হওয়া প্রয়োজন। অত্যন্ত কঠোরভাবে মাদকদ্রব্য উৎপাদন, পাচার ও প্রসারের সমস্ত পথ বন্ধ করতে হবে।

এ পাঠে আমরা জানলাম—

১. ধূমপানের কুফল,
২. ধূমপানের প্রতিকার,
৩. মাদকাসক্তির পরিচয়,
৪. মাদকাসক্তির কুফল,
৫. মাদকাসক্তির প্রতিকার,

আমরা এই মারাত্মক কুঅভ্যাস থেকে নিজেদের মুক্ত রাখব এবং সমাজকে মুক্ত রাখব। সুস্থ সুন্দর জীবনযাপন করতে ব্রতী হব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

- ১। আল-কুরআনে কোনটিকে হত্যার চেয়ে জঘন্য বলা হয়েছে?

ক. মিথ্যা বলা	খ. খেয়ানত করা
গ. গীবত করা	ঘ. ফিৎনা সৃষ্টি করা
- ২। কুরআন ও হাদীস-এর বিধান অনুযায়ী হারাম উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করলে –

ক. সমাজের লোকজন সম্মান করে না	খ. নিজের মনোবল কমে যায়
গ. সন্তানাদি প্রকৃত মানুষ হয় না	ঘ. ইবাদাত কবুল হয় না।
- ৩। ইসলামি শরীআ মতে কারো অনুপস্থিতিতে তার মিথ্যাচার নিয়ে আলোচনা করাকে বলে –

ক. নিন্দা	খ. মিথ্যাচার
গ. গীবত	ঘ. ফিৎনা
- ৪। একজন কর্মকর্তা ঘুষ নিয়ে থাকেন এবং ঘুষের সম্পূর্ণ টাকা তিনি অন্যত্র ভালো কাজে দান করেন। এই দানের জন্য তাঁর –

ক. সাওয়াব হবে, কারণ টাকাটা দানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে	খ. কম সাওয়াব হবে, কারণ টাকাটা ঘুষের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে
গ. গুনাহ হবে, কারণ টাকাটা ঘুষের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে	ঘ. গুনাহ অথবা সাওয়াব হবে না, কারণ টাকার সদ্যবহারের মাধ্যমে গুনাহ দূর হয়ে যায়।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

তোমার কোনো একজন মুসলিম প্রতিবেশী হেরোইন আসক্ত। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে, সে জোর দিয়ে বলে যে, হেরোইন হারাম বা নিষিদ্ধ বলে কুরআন হাদীসে উল্লেখ নেই। বিষয়টি সম্পর্কে একজন বিজ্ঞ আলেমকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান যে, ইসলামে হেরোইন সেবন অবশ্যই হারাম।

৫। হেরোইন সেবনকারীর পরিণতি কী হতে পারে?

- i. জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়
- ii. শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়
- iii. সমাজ কর্তৃক ঘৃণিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. ii ও iii |

৬। বিজ্ঞ আলেম হেরোইন সেবনকে হারাম বলেছেন, কারণ হেরোইন –

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| ক. নেশা সৃষ্টি করে | খ. খাবারে অবুচি হয় |
| গ. চিত্ত বিভ্রম হয় | ঘ. রক্তে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। |

নিচের হাদিস অনুসারে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মহানবী (স) বলেন, “যারা দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে সীমান্ত পাহারায় বিনিদ্র রজনী কাটায় তাদের জন্য জান্নাত।”

৭। এ হাদীসের মূল অর্থ হচ্ছে –

- | | |
|--------------------|--------------|
| ক. দেশপ্রেম | খ. আন্তরিকতা |
| গ. কর্তব্যপরায়ণতা | ঘ. সততা। |

৮। যারা সীমান্ত পাহারা দেয় ইসলামে তাদের বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণ তারা –

- i. জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে
- ii. বিনিদ্র রাত্রিযাপন করে
- iii. দেশপ্রেমী হিসেবে কর্তব্য পালন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও iii | ঘ. ii ও iii |

৯। তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে তুমি –

- i. ফরযসহ বেশি করে নফল নামায পড়বে
- ii. হারাম বর্জন করবে এবং হালাল গ্রহণ করবে
- iii. হাক্কুল্লাহ্ এবং হাক্কুল ইবাদ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

১০। ইসলামে পবিত্রতা অর্থ হচ্ছে –

- i. পোশাক পরিচ্ছদ সর্বদা পরিষ্কার ও পবিত্র রাখা
- ii. শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবসময় পরিষ্কার ও পবিত্র রাখা
- iii. মনকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিম সাহেব করিম সাহেবের নিকট ১০ হাজার টাকা আমানত রাখেন। করিম সাহেব এই টাকাগুলো তার ব্যবসায়ে লাগান। রহিম সাহেব একদিন টাকা ফেরত চাইলে করিম সাহেব তাৎক্ষণিক ফেরত দিতে ব্যর্থ হন। তিন মাস পরে

করিম সাহেব কিছু লাভসহ টাকা ফেরত দেন।

১১। এখানে আমানত হিসেবে করিম সাহেব -

- ক. ঐ টাকা চাওয়া মাত্র ফেরত দিবে এই শর্তে ব্যবহার করতে পারবে
- খ. ব্যবসায় ঐ টাকা ব্যবহার করতে পারবে
- গ. চাহিবামাত্র ফেরত দেওয়ার জন্য টাকা সংরক্ষণ করবেন
- ঘ. কিছু লাভসহ সমুদয় টাকা কিছু সময় পরে ফেরত দেবে।

১২। শরীআ অনুযায়ী এখানে করিম সাহেবের হাতে -

- i. আমানত রক্ষা হয়েছে
- ii. আমানতের খেয়ানত হয়েছে
- iii. লাভসহ আমানত রক্ষা হয়েছে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১। সালাম এবং জাকির দুই বন্ধু ব্যবসায়ে অংশীদার হিসেবে একটি মিষ্টির দোকান শুরু করে। বাজারে তাদের মিষ্টির চাহিদা প্রচুর। সালাম পরিকল্পনা করে যে, মিষ্টিতে কমমূল্যের কাপড়ের রং এবং কেমিক্যাল মিশিয়ে কম খরচে মিষ্টি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করবে। জাকির সালামের পরিকল্পনার সাথে একমত না হয়ে বলে যে, এটি একটি প্রতারণা এবং এ ব্যাপারে হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেছেন, 'যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' জাকির আরও বলে, 'যদি তুমি এ পরিকল্পনা ত্যাগ না কর তাহলে আমি তোমার সাথে ব্যবসা করব না।'
- ক. প্রতারণা কাকে বলে?
- খ. প্রতারণার একটি কুফল ব্যাখ্যা কর।
- গ. সালামের পরিকল্পনা অনুযায়ী মিষ্টিতে কাপড়ের রং ও কেমিক্যাল মেশালে ইসলামে তা বৈধ হবে না কেন? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেন, 'যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়'-বিশ্লেষণ কর।
- ২। আসিফ পরীক্ষায় প্রথম হওয়াতে ফয়সাল ঈর্ষান্বিত হয়ে আসিফ সম্পর্কে বদনাম করে। আসিফ অন্যের কাছ থেকে এ বিষয়টি জানার পর ফয়সালকে জিজ্ঞেস করলে ফয়সাল ক্ষিপ্ত হয় এবং ঝগড়া শুরু করে। বিষয়টি শিক্ষকের দৃষ্টিতে আসলে তিনি ফয়সালকে বলেন, 'তুমি গীবত করেছ। এভাবে গীবত করলে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ও ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়; যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।'
- ক. হিংসা-বিদ্বেষ কী?
- খ. গীবত কী সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
- গ. ফয়সাল কীভাবে নিজেদের গীবত থেকে বিরত রাখতে পারতো?
- ঘ. গীবত থেকে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ও ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়'- বিশ্লেষণ কর।
- ৩। হাবিবা তার বান্ধবীদের বাসায় আসতে দাওয়াত করল। ওয়াদা মোতাবেক সকল বান্ধবীই আসল কিন্তু নাহারকে দেখা গেল না। কিছুদিন পর নাহারের সাথে দেখা হলে হাবিবা নাহারকে এড়িয়ে যায়। বিষয়টি নাহারকে পীড়া দেয়। নাহার এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে চাইলে, হাবিবা বলল, ওয়াদা ভঙ্গকারীর সাথে কিসের কথা? এতে নাহারও রেগে যায়। তখন হাবিবা বলল, তোমার মনে থাকার কথা, হাদীসে আছে 'মু'মিনের ওয়াদা ঋণস্বরূপ।'
- ক. ওয়াদা ভঙ্গ করা কিসের লক্ষণ?
- খ. ওয়াদা পালন বলতে কী বোঝায়? নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা কর।
- গ. হাবিবা কীভাবে তার বান্ধবীকে ওয়াদা পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?
- ঘ. 'মু'মিনের ওয়াদা ঋণস্বরূপ'- এ উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

অধ্যায়-৫

জীবনাদর্শ

মহানবী (স)-এর জীবনাদর্শ

প্রাক ইসলামী যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর বিধান ও নবী-রাসূলগণের আদর্শ ভুলে সর্বপ্রকার জঘন্যতম অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের আচার-আচরণ ছিল বর্বর ও মানবতা বিরোধী। এ কারণে এ যুগ আইয়্যামে জাহিলিয়া (অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ) হিসেবে পরিচিত। এ সময়ে মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু কোন নিরাপত্তা ছিল না। শান্তি-শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা বলতে কিছু ছিল না। নরহত্যা, রাহাজানি, ডাকাতি, মারামারি, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, জুয়াখেলা, মদ্যপান, সুদ, ব্যভিচার ছিল তখনকার লোকদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শত শত দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ ও তার পূজা করা, তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ছিল তাদের ধর্ম। কা'বা ঘরে তারা ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। এক কথায় পাপ-পঙ্কিলতার অতল তলে নিমজ্জিত ছিল তারা। মানবতার এ চরম দুর্দিনে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়বন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, রাহমাতুল্লিলি আলামীন হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে পাঠালেন বিশ্বমানবতার শান্তির দূত হিসেবে। পথহারা আত্মভোলা মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ নির্দেশ করতে।

শৈশব

আরবের কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ্ এবং মাতার নাম আমিনা। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন।

শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্রে ইনসাফের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। তিনি ধাত্রীমাতা হালিমার একটি স্তন পান করতেন এবং অন্যটি তাঁর দুধ ভাই আবদুল্লাহর জন্য রেখে দিতেন। মাতৃস্নেহে পাঁচ বছর পর্যন্ত লালন-পালন করে হালিমা শিশু মুহাম্মাদকে মা আমিনার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে যান। ছয় বছর বয়সে তাঁর মা আমিনা ইনতিকাল করেন। প্রিয়নবী তাঁর পিতামাতা উভয়কে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন।

কৈশোর

হযরত মুহাম্মাদ (স) দাদা আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হতে থাকেন। কিন্তু আট বছর বয়সে তিনি দাদাকেও হারান। এরপর তিনি চাচা আবু তালিবের স্নেহে লালিত-পালিত হতে থাকেন। কিশোর মুহাম্মাদ (স) ছিলেন কর্মঠ। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি আবু তালিবের অসচ্ছল সংসারে নানাভাবে সাহায্য করেন। বাড়তি আয়ের জন্য মেষ চরান। মেষপালক রাখাল বালকদের জন্য তিনি ছিলেন আদর্শ। তাদের সাথে তিনি সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বজায় রাখতেন। চাচার সঙ্গে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যান। যাত্রাপথে বহীরা নামক পাত্রীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। বহীরা তাঁকে অসাধারণ বালক বলে উল্লেখ করেন এবং তিনি শেষ যামানার নবী হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে বালক মুহাম্মাদ (স) প্রত্যক্ষ করলেন ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা। এ যুদ্ধ ছিল নিষিদ্ধ মাসে। এ ছাড়া কাইস গোত্র অন্যায়ভাবে এ যুদ্ধ কুরাইশদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। এজন্য একে হারবুল ফিজার বা অন্যায় সময় বলা হয়। এ যুদ্ধ পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুহাম্মাদ (স) নিজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন নি, তবে তিনি যুদ্ধের বিভীষিকাময় কল্প দৃশ্য অবলোকন করেছিলেন। এতে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠল। আহতদের আর্তনাদে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। যিনি শান্তির ধর্ম ইসলামের দিশারী হবেন, এ অশান্তি তাঁর সহ্য হল না। তাই তিনি শান্তিকামী উৎসাহী যুবকদের নিয়ে গঠন করলেন “হিলফুল ফুযূল” (শান্তিসংঘ)।

আর্তের সেবা করা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে গোত্রে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখা ছিল এ শান্তিসংঘের উদ্দেশ্য।

বস্তুত অবাধ লাগে যে, আধুনিক বিশ্বের আজকের জাতিসংঘ সেদিনকার যুবসংঘ “হিলফুল ফুয়ুলের” কাছে অনেকাংশে ঋণী। তবে পার্থক্য এই যে, সে যুবসংঘ তাদের নীতিমালা যে নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছিল, আজকের জাতিসংঘ তা করতে পারছে না।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আচার-ব্যবহার, আমানতদারী, সত্যবাদিতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে আরবরা তাঁকে উপাধি দেয় আল-আমীন (বিশ্বাসী)। নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর যারা তাঁর ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারাও তাঁকে কখনও মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী বলতে পারেনি।

যুবক মুহাম্মাদ (স)-এর সততা, সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক মাধুর্যের কথা শুনে মক্কার সম্পদশালী বিদূষী, বিধবা মহিলা খাদিজা নিজ ব্যবসায়ের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেন। তিনি ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া গমন করেন এবং ব্যবসায়ে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেন। খাদিজার ব্যবসা পরিচালনায় হযরত মুহাম্মাদ (স) সততার যে নবীর স্থাপন করেন তা সর্বকালের যুবকদের জন্য আদর্শ। এ সফরে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্র পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করার জন্য খাদিজা তাঁর বিশৃঙ্খল কর্মচারী মাইসারাকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। মাইসারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সততা, বিশৃঙ্খলতা ও কর্মদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে মুগ্ধ হয়ে খাদিজা নিজেই মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। চাচা আবু তালিবের সম্মতিক্রমে খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। এ সময়ে তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর আর খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। বিবাহের পর খাদিজার সৌজন্য ও আন্তরিকতায় প্রচুর সম্পদের মালিক হন হযরত মুহাম্মাদ (স)। কিন্তু তিনি এ সম্পদ ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশে ব্যয় না করে অসহায় দুঃখী আর্ত-পীড়িতদের সেবায় ব্যয় করেন।

কা'বাঘরে হাজরে আস্‌ওয়াদ স্থাপনের দুর্লভ সম্মান ও গৌরব লাভের ব্যাপার নিয়ে যখন গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হল, তখন স্থির হল যে, পরের দিন সবার আগে যে কা'বায় প্রবেশ করবে তারই ফায়সালা মেনে নেওয়া হবে। পরদিন সকলের আগে হযরত মুহাম্মাদ (স) কা'বাঘরে প্রবেশ করলে সবাই সম্মুখে বলে উঠল, “এই এসেছেন আল্-আমীন, আমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ও আস্থাশীল।” তাঁর ব্যাপারে কারও কোন আপত্তি রইল না। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে শান্তিপূর্ণভাবে তিনি এর মীমাংসা করে দিলেন। অনিবার্য রক্তক্ষয় থেকে তারা মুক্তি পেল।

বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে অনেক অনিবার্য সংঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

নবুওয়্যাত প্রাপ্তি

হযরত মুহাম্মাদ (স) হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালীন এক রাতে জিবরাঈল (আ) তাঁর কাছে ওহী নিয়ে আসেন এবং তিনি নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। এ সময়ে তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তিনি ঘরে ফিরে খাদিজা (রা)-কে বললেন : “আমাকে বসত্রাবৃত কর, আমাকে বসত্রাবৃত কর।” তিনি খাদিজার নিকট সব ঘটনা প্রকাশ করে বললেন : “আমি আমার জীবনের আশঙ্কা করছি।” তখন খাদিজা (রা) নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : “না, কখনও না। আল্লাহর কসম, তিনি কখনই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহার করেন, দুঃস্থ-দুর্বলদের থাকা ও খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করেন। নিঃস্ব ও অভাবীদের উপার্জনক্ষম করেন। মেহমানদের সেবাযত্ন করেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে (লোকদের) সাহায্য করেন।”

খাদিজা (রা)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে মহানবী (স) কি রকম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মানবিক মহৎ গুণাবলির অনুশীলন করতেন, মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন।

ঈমানের দাওয়াত

মহানবী (স) আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক প্রথমে নিকট আত্মীয়-স্বজনের কাছে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিতে লাগলেন। নবী গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এরপর আল্লাহ তাঁকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিলে তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। এতে মূর্তিপূজারীরা তাঁর বিরোধিতা আরম্ভ করল। তাঁর ওপর নানারকম নির্যাতন চালাতে লাগল। তারা মহানবী (স)-কে নেতৃত্ব, ধন-সম্পদের প্রলোভন দেখালে তিনি বলেন :

“আমার এক হাতে সূর্য ও অন্য হাতে চাঁদ এনে দিলেও আমি এ সত্য প্রচার থেকে বিরত হব না।” মহানবী (স)-এর এ উক্তি দ্বারা তাঁর সত্যনিষ্ঠা, অপূর্ব ত্যাগ, দৃঢ়তা ও সংযমের পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

খাদিজা ও আবু তালিবের ইন্তিকাল

নবুওয়্যাতের দশম বছরে মহানবী (স) তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী ও তাঁর স্নেহপরায়ণ চাচাকে হারান। এতে তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। অসহ্য শোক-বেদনা ও কাফিরদের শত অত্যাচারের মুখেও তিনি দ্বীন প্রচারের কাজ চালিয়ে যান। তায়িফে যান সেখানকার মানুষদের দ্বীনের দাওয়াত দিতে। সেখানকার মানুষ তো ইসলাম গ্রহণ করলই না; বরং তারা প্রস্তরাঘাতে তাঁর পবিত্র শরীরকে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে ছাড়ল। নবী (স) এমন মুহূর্তেও তায়িফবাসীদের জন্য বদদুআ করলেন না। তাদের জন্য ক্ষমা চাইলেন আল্লাহর কাছে। ইতিহাসে এ ক্ষমার আর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মক্কায় কাফিরদের সীমাহীন অত্যাচার ও তায়িফবাসীদের দুর্ব্যবহারে মহানবী (স) যখন নিদারুণ মর্মান্বিত, ব্যথিত, তখন আল্লাহ তাঁকে তাঁর সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। তিনি মিরাজে গমন করলেন। এ মিরাজে তিনি আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হলেন।

হিজরত

মক্কায় যখন কুরাইশদের চরম বিরোধিতার কারণে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাধাগ্রস্ত হতে লাগল, তখন আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (স) মদীনায হিজরত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মক্কার কাফিররা যখন দেখল যে, আস্তে আস্তে মুসলমানরা মক্কা ছেড়ে হিজরত করে চলে যাচ্ছে, মক্কা প্রায় মুসলিমশূন্য হয়ে গিয়েছে, তখন তারা মনে করল, নবী হয়ত এক ফাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মহানবী (স)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল এবং সে মোতাবেক এক রাতে নবীর ঘর অবরোধ করল। প্রত্যুষে নবীকে হত্যা করার অপেক্ষায় থাকল; কিন্তু আল্লাহর কুদরতে মহানবী (স) তাদের চোখে ধুলি দিয়ে আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। গচ্ছিত সম্পদ প্রাপকদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মহানবী (স) হযরত আলী (রা)-কে তাঁর ঘরে রেখে যান। কাফিররা ঘরে ঢুকে নবী (স)-এর বিছানায় আলী (রা)-কে দেখতে পেয়ে ক্রোধে অধীর হল। কিন্তু নবী (স)-এর আমানতদারী দেখে তারা মনে মনে লজ্জিত হল। যাকে হত্যা করার জন্য তাদের এ প্রচেষ্টা সে শত্রু এত মহৎ ও উদার হতে পারে এ কথা তারা ভাবতেও পারে নি। মহানবী (স) ও আবু বকর সিদ্দীক (রা) কিছু দূর অগ্রসর হয়ে মক্কার সাওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিলেন। এদিকে কাফিররা তাঁদের খুঁজতে খুঁজতে একেবারে গুহার মুখে এসে পড়ল। আবু বকর (রা) গুহার মুখে কাফিরদের গতিবিধি লক্ষ করে একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন। নবী (স) বললেন : “আবু বকর, চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।” আল্লাহর ওপর মহানবী (স)-এর ছিল গভীর আস্থা, অটল বিশ্বাস। তিনি জীবনের সব কাজে আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন।

মহানবী (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে সেপ্টেম্বর হিজরত করে মদীনায পৌছেন। মদীনার আবাল-বৃন্দ-বনিতা পরম আগ্রহ ও ভালবাসায় মহানবী (স)-কে গ্রহণ করল; মদীনার ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। নবীর শুভাগমনে খুশি হয়ে মদীনার মেয়েরা সুললিত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন : তালাআল বাদরুআলাইনা.....

“দেখ চেয়ে ঐ চাঁদ উঠেছে

গগণ কিনারায়।”

মদীনায এসে মহানবী (স) স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। মুসলিম জাতি আজ যদি ভ্রাতৃঘাতী কার্যকলাপ পরিহার করে মদীনার আনসারগণের ন্যায় বিপন্ন মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে তাহলে আজও মুসলিম জাহান শান্তি ও সমৃদ্ধির নীড়ে পরিণত হতে পারে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)

মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। মহানবী (স)-এর সঙ্গে ছিল আবু বকর (রা)-এর গভীর বন্ধুত্ব। মহানবী (স) যখন ইসলামের দাওয়াত দেন তখন তিনিই বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে নবী (স)-এর সঙ্গে ছায়ার মত থাকতেন।

তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর সকল ধনসম্পদ নবী (স)-এর সামনে হাযির করলেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসর্বস্ব ত্যাগের এ নবীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

মহানবী (স)-এর প্রতি আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ছিল অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। তিনি যখন মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করলেন তখন আবু বকর (রা) নির্ধ্বন্যে তা বিশ্বাস করলেন। এ জন্য মহানবী (স) তাঁকে উপাধি দিলেন সিদ্দীক বা বিশ্বাসী।

মহানবী (স)-এর ইনতিকালের পর তিনি মুসলিম জাহানের খলীফা নির্বাচিত হন। খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি বলেন : “আমি যতদিন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নির্দেশিত পথে চলি ততদিন তোমরা আমায় অনুসরণ করবে আর আমাকে সাহায্য করবে। আর ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সজ্ঞো সজ্ঞো সংশোধন করে দেবে। তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের হক আদায় না করা পর্যন্ত তারা আমার কাছে সবল ও শক্তিশালী। আর যারা সবল তাদের নিকট থেকে হকদারের হক আদায় না করা পর্যন্ত তারা আমার নিকট দুর্বল।” আবু বকর (রা)-এর এ ভাষণ সর্বকালের শাসকদের জন্য আদর্শ। আজও যদি শাসকবৃন্দ আল্লাহর ভয়ে নিজেদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হন এবং দোষ-ত্রুটি সংশোধনের মানসিকতা সৃষ্টি করেন তাহলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা অবশ্যই বিরাজ করবে।

মহানবী (স)-এর ইনতিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। কিছু লোক মিথ্যা নবুওয়্যাতের দাবি করে, আবার কেউ কেউ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করে। আবু বকর (রা) দৃঢ়তার সাথে সকল বিশৃঙ্খলা দমন করে শান্তি ফিরিয়ে আনেন।

কুরআন সংরক্ষণ

ইয়ামামার যুগে অনেক হাফিয সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এতে কুরআন বিপন্ন ও বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে আবু বকর (রা) সমগ্র কুরআন গ্রন্থাকারে একত্র করলেন। এসব মহৎ কাজের জন্য তাঁকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

আবু বকর (রা) পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করা পছন্দ করতেন। খলীফা হওয়ার পরও তিনি কিছু দিন সংসারের খরচের জন্য কাপড়ের ব্যবসা করেছেন। রাজকোষ থেকে তিনি সামান্য ভাতা নিতেন। মুসলিম জাহানের খলীফা হয়েও হযরত আবু বকর (রা) জাতীয় সম্পদ ভোগ করার ব্যাপারে যে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন তা সর্বকালের মানুষের আদর্শ হয়ে থাকবে।

হযরত উমার ফারুক (রা)

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ফারুক (রা) ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত ও সৎ চরিত্রের অধিকারী। বাল্যকালে তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় সুনাম অর্জন করেন। বড় হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। তিনি ছিলেন নামকরা কুস্তিগীর, সাহসী যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা।

ইসলাম গ্রহণ

তিনি প্রথমে ছিলেন ইসলামের ঘোরতর শত্রু। মহানবী (স)-কে হত্যা করার জন্য তিনি কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পথিমধ্যে জানতে পারেন যে, তাঁর বোন ফাতিমা ও ভগ্নীপতি সাঈদ মুসলমান হয়ে গেছেন। এতে তিনি ক্রোধে অস্থির হয়ে বোনের বাড়িতে চলে যান। তিনি বোন ও ভগ্নীপতির ইসলামের প্রতি দৃঢ়তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। তাঁর ভাবান্তর ঘটে। তিনি মুসলমান হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং নবী (স)-এর দরবারে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমান হয়ে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন : “আর গোপনে নয়, এবার প্রকাশ্যে কা'বাঘরের সামনে সালাত আদায় করব।” মহানবী (স) খুশি হয়ে তাঁকে উপাধি দিলেন ফারুক (সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী)।

হযরত উমার (রা) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য তাঁর ধনসম্পদ উৎসর্গ করেছেন। সকল যুদ্ধে মহানবী (স)-এর সঙ্গী হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন।

ন্যায় বিচারক

হযরত উমার (রা)-এর বিচার-ব্যবস্থা ছিল নিরপেক্ষ ও নিখুঁত। আইনের চোখে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব, আপন-পর কোন ভেদাভেদ ছিল না। মদ্যপানের অপরাধে স্ত্রীয় পুত্র আবু শাহ্মাকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন।

হযরত উমার (রা) ছিলেন গণতন্ত্রমণ্ড। রাষ্ট্রের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্পাদন করতেন।

চরিত্র

হযরত উমার (রা)-এর চরিত্রে কোমলতা ও কঠোরতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তিনি যেমন আইনের ব্যাপারে ছিলেন বজ্রের মত কঠোর, তেমনি মানুষের দুঃখে-কষ্টে ছিলেন পুষ্পের মত কোমল। জনগণের দুঃখ-কষ্টের কথা অবহিত হওয়ার জন্য তিনি গভীর রাতে মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্নার আওয়ায শুনে তিনি নিজের কাঁধে আটার বস্তা বহন করে নিয়ে যান তাদের তাঁবুতে। স্ত্রীয় সহধর্মিণী উম্মে কুলসুমকে নিয়ে যান এক বেদুঈনের ঘরে তার প্রসব বেদনায় কাতর স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য। পৃথিবীর রাজা-বাদশাহদের ইতিহাসে প্রজাবাৎসল্যের এ নযীর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মানবদরদী হযরত উমার (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় অন্যদের মত শাসকদের জন্যও রয়েছে জবাবদিহিতার বিধান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উমার (রা)-কে এক জন সাধারণ লোকের সামনে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। অভিযোগটি ছিল এই যে,- “বায়তুলমাল থেকে প্রাপ্ত কাপড় দিয়ে কারও পুরো একটি জামা হয় নি, অথচ খলীফার গায়ে সেই কাপড়ের একটি পুরো জামা দেখা যাচ্ছে। খলীফা অতিরিক্ত কাপড় কোথা থেকে পেলেন?” খলীফার পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ উত্তর দিলেন : “আমি আমার অংশটুকু আব্বাকে দিয়ে দিয়েছি। এতে তাঁর জামা তৈরি হয়েছে”। আমাদের সমাজে যদি শাসকদের জন্য জবাবদিহিতার বিধান করা হয় তাহলে তাঁরাও এ আদর্শে আদর্শবান হবেন বলে আশা করা যায়।

হযরত উসমান (রা)

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) ৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়্যা গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও লজ্জাশীল ছিলেন। শিক্ষা দীক্ষায়ও ছিলেন স্নানামধ্য। ৩৪ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর চাচা হাকাম তাঁকে নানারকম নির্যাতন করে। সব নির্যাতন সহ্য করে তিনি ইসলামে অটল-অবিচল থাকেন। আত্মীয়দের নির্যাতন অসহ্য পর্যায়ে পৌঁছলে তিনি মহানবী (স)-এর কন্যা ও স্ত্রীয় সহধর্মিণী বুকাইয়াকে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

ইসলামের খিদমত

হযরত উসমান (রা) মহানবী (স)-এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এ কাজে তাঁর ধন-সম্পদ উদার হস্তে ব্যয় করতে থাকেন। হিজরত করার পর এক বার মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি দুস্থদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করেন। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় মহানবী (স) মসজিদে নববী সম্প্রসারণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি মসজিদ সংলগ্ন জমি ক্রয় করে এর সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। তাবুক যুদ্ধে ৩০০০০ সৈন্যের এক-তৃতীয়াংশের ব্যয়ভার তিনি একাই বহন করেন এবং রোমীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এক হাজার উট দান করেন।

হযরত উসমান (রা)-কে আব্বাহ প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন। ইসলামের দুর্দিনে তিনি অকাতরে তা ব্যয় করে সম্পদের হক আদায় করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি সর্বকালের বিশ্বেশালী লোকদের জন্য আদর্শ।

কুরআন সংকলন

আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন তিলাওয়াত করা হত। পরবর্তীতে এটি মুসলিম উম্মাহর জন্য জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। হযরত উসমান (রা) অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ ব্যাপারে ত্বরিত পদক্ষেপ নেন এবং হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট রক্ষিত কুরআনের মূল কপি এনে তার অনেকগুলো কপি করিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। এ জন্য তাকে “জামিউল কুরআন” বা কুরআন সংকলনকারী বলা হয়।

হযরত আলী (রা)

হযরত আলী (রা) ছিলেন আবু তালিবের পুত্র। শিশু বয়স থেকেই তিনি মহানবী (স)-এর সঙ্গে লালিত-পালিত হন। মহানবী (স)-এর প্রতি ছিল তাঁর গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। তিনি যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন তখন আলী (রা)-এর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। এ কচি বয়সেই তিনি বিনাদ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (স)-কে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন ও তাঁর কথা মান্য করতেন। তিনি যখন হিজরত করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তখন আলী (রা)-কে তাঁর বিছানায় শুইয়ে রেখে যান গচ্ছিত মালামাল মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য। আলী (রা) জানতেন, এতে তাঁর জীবনের ঝুঁকি আছে। এতদসত্ত্বেও তিনি নবীর নির্দেশ মানতে দ্বিধা করেন নি। হযরত আলী (রা)-এর কাছে জীবনের মায়া বড় ছিল না। নবী কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনই ছিল বড় ব্যাপার। সত্যের পথে নবীর জন্য জীবন উৎসর্গ করার এ রকম নবীর দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল।

বীরত্ব

হযরত আলী (রা) ছিলেন এক জন শক্তিশালী যোদ্ধা। অসাধারণ শৌর্য-বীর্য ও বিক্রমের অধিকারী। তাঁর নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হত। বদর যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের জন্য নবী (স) তাঁকে ‘যুলফিকার’ নামক তরবারি উপহার দিয়েছিলেন। এ তরবারি মুসলিম উম্মাহর শৌর্য-বীর্যের প্রতীক খাইবারের সুরক্ষিত ‘কামূস’ দুর্গ জয় করলে মহানবী (স) তাঁকে উপাধি দেন “আসাদুল্লাহ” বা আল্লাহর সিংহ।

জ্ঞান সাধনা

হযরত আলী (রা) ছিলেন জ্ঞানের সাধক। নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তিনি জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখতেন। হাদীস, তাফসীর ও আরবি ব্যাকরণে ছিল তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। মহানবী (স) বলেছেন : “আমি জ্ঞানের শহর, আর আলী তার দরজা।”

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

হযরত আলী (রা) অত্যন্ত সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। সম্পদ বলতে তাঁর তেমন কিছু ছিল না। কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কখনও না খেয়ে থাকতেন। তবুও আক্ষেপ করতেন না। মুসলিম জাহানের খলীফা হয়েও তিনি সংসারের কাজ নিজেই করতেন। তাঁর সহধর্মিণী নবী তনয়া ফাতিমা (রা) নিজের হাতে যাঁতা পিষে গম গুঁড়ো করতেন। তাঁর কোন দাসদাসী ছিল না।

ইসলামের সেবা

সাহসিকতা, বীরত্ব, জ্ঞানচর্চা, অনাড়ম্বর জীবনযাপনে হযরত আলী (রা) ছিলেন আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করলে বর্তমান অশান্ত দুনিয়া শান্তির পথ খুঁজে পেতে পারে।

মুসলিম মনীষী

ভূমিকা

ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানব কল্যাণের ধর্ম। ইসলামে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল-কুরআনের প্রথম বাণীই হল- “পড় (জ্ঞান আহরণ কর)।” আল-কুরআনকে বলা হয়েছে আল হাকীম, বিজ্ঞানময় কুরআন। এতে আরও বলা হয়েছে- “যাকে হিকমত (সঠিক জ্ঞান) দান করা হয়েছে; তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।” মহানবী (স) বলেছেন : “প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয।” “দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।” “জ্ঞান অর্জন করতে প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশে যাও।”

শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মহানবী (স) মক্কাতে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আরকাম (রা)-এর বাড়িতে ‘দারুল আরকাম’ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। হিজরতের পর মদীনায় মসজিদে নববীর উত্তর-পূর্বদিকের উঁচুস্থানে ‘সুফফা’ নামের একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মক্কা বিজয়ের পর মসজিদে নববী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। সেখানে ভিড় জমাতেন কুফা, বাসরা, সিরিয়া, মিসর, পারস্য ও সুদূর রোম থেকে আগত শিক্ষার্থীরা। শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মহানবী (স) বদরের কাফির যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করেছিলেন নিরক্ষর মুসলমানদের শিক্ষিত করে তোলা। এ লক্ষ্যে তিনি সাহাবীগণকে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাতেন। মহানবী (স)-এর ইনতিকালের পর তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে আরও মহিমামণ্ডিত করে তোলেন। জ্ঞানের দীপশিখা হাতে নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন তাঁরা। প্রতিষ্ঠা করেন অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার। আব্বাসীয় খলীফা মনসুর ও মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রিক, সিরিয়া, সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায় লিখিত ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থসমূহ আরবিতে অনুবাদ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথ সুগম করা হয়। খলীফা মামুন এ উদ্দেশ্যে বাগদাদে ‘বায়তুল হিকমাহ’ (বিজ্ঞানাগার) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মুসলমানদের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য জাতি মুসলমানদের সঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। অতএব একথা নির্দিষ্ট বলা যায় যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের মূলে রয়েছে মুসলমানদের বিরাট অবদান।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানগণ যে অবদান রেখে গেছেন তা অন্যান্য জাতির জন্য ঈর্ষা ও বিস্ময়ের বিষয়। মুসলমানগণ হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী; ফিক্হ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা; তাফসীর ও ইতিহাস শাস্ত্রে ইব্ন জারীর তাবারী ও দর্শনে ইমাম গাযালীর অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

ইব্ন জারীর তাবারী

বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য তাফসীর ও ইতিহাস প্রণয়নে ইব্ন জারীর তাবারীর অবদান সর্বাধিক। তাঁর তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থকে বিশুদ্ধতম তাফসীর ও ইতিহাস বলা হয়ে থাকে। কুরআনের তাফসীর প্রণয়নে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দেন। তিনি তাফসীর সম্পর্কীয় প্রচুর হাদীস সংগ্রহ করেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে তাঁর তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ কারণে এ তাফসীর গ্রন্থখানি অত্যন্ত প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য। তিনি এ তাফসীর গ্রন্থে ধর্মীয় নীতি ও আইন সম্পর্কীয় ব্যাপারেও পর্যালোচনা করেছেন। তাফসীর গ্রন্থখানির নাম ‘জামিউল বায়ান ফী তাফসীর আল-কুরআন’ এবং ইতিহাস গ্রন্থখানির নাম ‘তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলুক’।

ইমাম গায়ালী

ইমাম গায়ালী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সূফী দার্শনিক। তিনি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য নৈতিক শিক্ষা যে অত্যাवश्यक তা তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তলে ধরেছেন। তিনি সূফীবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইসলামী অনুশাসনসমূহের দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে “ইহুইয়াউ উলুম আদ-দীন”। প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ বর্ণনার মাধ্যমে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে মুসলিম বিশ্বে তিনি “হুজ্জাতুল ইসলাম” নামে অভিহিত হন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান

চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির মূলে রয়েছে মুসলমানদের বিরাট ভূমিকা। তাঁদের মধ্যে আবু বকর আল-রাযী, ইবন সীনা, হাসান ইবন হাইসাম, আবুল কাসেম জাহরাবী, আলী তাবারী সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

আবু বকর আল-রাযী

আবু বকর আল-রাযী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও শল্য চিকিৎসাবিদ। তিনি দীর্ঘদিন জুন্দেশাহপুর ও বাগদাদের সরকারি চিকিৎসালয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তৎকালীন সময়ে তাঁর সুনাম এতই বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে, পশ্চিম এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপ থেকেও অগণিত রোগী তাঁর নিকট চিকিৎসার জন্য আসত।

শল্য চিকিৎসায় আল-রাযী ছিলেন তৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি গ্রিকদের চেয়েও উন্নত পন্থায় “অস্ত্রোপচার” করতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ দুই শতাব্দিক। এর মধ্যে শতাব্দিক চিকিৎসা বিষয়ক। বসন্ত ও হাম রোগ বিষয়ে তাঁর রচিত “আল-জুদারী ওয়াল্ হাসবাহ” নামক গ্রন্থখানি এতই মৌলিক ছিল যে, খ্রিস্ট জগতের লোকেরা এর পূর্বে এ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তেমন অগ্রগতিই লাভ করতে পারে নি। তাঁর আর একটি গ্রন্থের নাম ‘কিতাবুল মানসুরী’ (১০ খণ্ডে সমাপ্ত)। এ গ্রন্থ দু খানি চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে আল-রাযীকে চির অমর করে রেখেছে।

ইবন সীনা

ইবন সীনা বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসা প্রণালী এবং শল্য চিকিৎসার দিশারী মনে করা হয়। ইবন সীনা ২৪ খানি ছোট ও ২১ খানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কেউ কেউ তাঁর বই সংখ্যা শতাব্দিক বলে উল্লেখ করেছেন। চিকিৎসা বিষয়ে ‘কানুন ফিত্ তিব্ব’ গ্রন্থটি একটি অনবদ্য সৃষ্টি। চিকিৎসা বিষয়ে এর সমপর্যায়ের কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত দেখা যায় না। ড. ওসলার এ গ্রন্থকে চিকিৎসাশাস্ত্রে বাইবেল বলে উল্লেখ করেছেন। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের আশ্চর্য রকম সমাবেশ থাকার কারণে গ্রন্থটিকে ইউনানী ও জারবী চিকিৎসাশাস্ত্রের বৃহৎ সংহতি বলা চলে।

হাসান ইবন হাইসাম

বিখ্যাত দৃষ্টিবিজ্ঞানী হাসান ইবন হাইসাম দৃষ্টিবিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে শতাব্দিক গ্রন্থ রচনা করেন। ‘কিতাবুল মানাযির’ নামক দৃষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থটি তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। এ গ্রন্থখানিই মধ্যযুগে আলোক বিজ্ঞান বিষয়ে একমাত্র গ্রন্থ ছিল বলে এ বিষয়ের গবেষক রোজার বেকন, নিউলার্ডে, কেপলার এ গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেই তাঁদের গবেষণা পরিচালনা করেন।

দৃষ্টিশক্তি এবং এর প্রতিসরণ ও প্রতিফলন বিষয়ে গ্রিকদের ভুল ধারণা খণ্ডন করে ইবন হাইসাম প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, “বাহ্য পদার্থ থেকেই আমাদের চোখে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়, চোখ থেকে বের হওয়া আলো বাহ্য পদার্থকে দৃষ্টিগোচর করায় না।” তিনিই ম্যাগনিফাইং গ্লাস আবিষ্কার করেন। আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা গতি বিজ্ঞানকে তাঁদেরই একচেটিয়া অধিকার বলে দাবি করলেও ইবন হাইসাম এ বিষয়ে তাদের বহু পূর্বে বিস্তারিত

বর্ণনা করেছিলেন। বায়ুমণ্ডলের ওয়ন, চাপ এবং তারতম্যের জন্য জড় পদার্থের ওয়নেও তারতম্য ঘটে— এ বিষয়ে এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিষয়েও তার গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। স্যার আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) কে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক মনে করা হলেও ইব্ন হাইসাম এ বিষয়ের প্রথম আবিষ্কারক ছিলেন সন্দেহ নেই।

আলী তাবারী

আলী তাবারী চিকিৎসা বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ‘ফিরদাউস আল-হিক্‌মাহ্ ফিত-তিব্ব’ বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বর্গ নামক গ্রন্থটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থটিকে আরবি চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রথম বিশুকোষ বলা যেতে পারে। এতে চিকিৎসার ধারা ও পদ্ধতি, ওষুধ তৈরির প্রক্রিয়া, গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের অবদান

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের বিস্ময়কর অবদান রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষে মুসলমানদের অগ্রণী ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই।

রসায়ন শাস্ত্র অবদান

মুসলমানগণ বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা আলকেমী বা রসায়নে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইব্ন হাইয়্যান বিশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ হিসেবে পরিচিত। শুধু রসায়ন শাস্ত্রেই নয় বরং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি দুই হাজারের অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। আধুনিক বিশ্ববিখ্যাত রসায়নবিদদের তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক। জগদ্বিখ্যাত রসায়নবিদ জাবির বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছিলেন।

মারকাসাইট থেকে স্থায়ী লেখার কালি, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড থেকে কাচ ইত্যাদি তৈরি প্রণালী তাঁর জানা ছিল। সাইট্রিক এসিড, আর্সেনিক, এন্টিমনি, সিলভার নাইট্রেট, কিউপ্রিক ক্লোরাইড প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

গণিত শাস্ত্র অবদান

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত গণিত শাস্ত্রেও মুসলমানদের অবদান অসাধারণ। যে সকল মনীষী এ শাস্ত্রে কালজয়ী অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আল-বিরুনী, নাসীরুদ্দীন তুসী, উমার খাইয়াম, আবদুল্লাহ আল বাত্তানী ও মুসা আল-খারিয্মী প্রমুখ।

আল-বিরুনী অংকশাস্ত্রে বিশ্ববিখ্যাত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ ‘আল-কানুন আল মাসউদী’কে অংকশাস্ত্রের বিশুকোষ বলা হয়। এতে জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ক্যালকুলাস প্রভৃতি বিষয়ের সূক্ষ্ম, জটিল ও গাণিতিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত চমৎকার আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থেই তিনি পৃথিবীর পরিমাপ সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে তা আজও প্রতিষ্ঠিত।

উমার খাইয়াম

উমার খাইয়াম ছিলেন প্রথম শ্রেণীর গাণিতিক। তাঁর ‘কিতাবুল জিবাব’ গণিত শাস্ত্রের একখানি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। এতে তিনি ঘনসমীকরণ সম্বন্ধে বেশি আলোচনা করেছেন। সম্পাদ্য প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য উপায়ে বাস্তব সমাধানের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি গ্রিকদের চেয়েও অনেক বেশি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

মুসা আল-খারিয্মী

গণিত শাস্ত্রে সর্বাধিক বিখ্যাত মনীষী হচ্ছেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসা আল-খারিয্মী। তাঁকে বীজগণিত তথা গণিত শাস্ত্রের জনক বলা হয়। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রিক ও ভারতীয় গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করে মুসলমানদের বিজ্ঞান চর্চায় পথ সুগম করেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ‘সিন্ধান্ত’ গ্রন্থখানি তিনি আরবিতে অনুবাদ করেন। তিনি এবং তাঁর কয়েক জন সাথী ভূতত্ত্ববিদ ‘সূরত আল্-আর্দ’ বা বিশ্বেশ্বর একটি বাস্তবরূপ প্রস্তুত করেছিলেন। এটাই পরবর্তীকালে বিশ্বেশ্বর মানচিত্র অঙ্কনের মডেল হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। ভূগোলবিদগণ পৃথিবীকে যে সাতটি মহাদেশে বিভক্ত করেছেন তা খারিয়মীর বর্ণিত সপ্ত ইকলীমের ভিত্তিতেই বিশ্বেশ্বর মানচিত্র অঙ্কন, বিশ্বেশ্বর পরিধি, অক্ষরেখা, দ্রাঘিমা এবং জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞানই পরবর্তীতে এ বিষয়ে পথিকৃ্তের কাজ করে। বীজ গণিতের সর্বপ্রথম আবিষ্কারক হলেন আল্-খারিয়মী। এ বিষয়ে তাঁর রচিত ‘হিসাব আল্-জাব্র ওয়াল্ মুকাবালাহ্’ গ্রন্থের নামানুসারে এ শাস্ত্রকে পরবর্তীতে ইউরোপীয়রা ‘আলজেব্রা’ নামকরণ করে। খারিয়মীর এ গ্রন্থে আট শতাধিক বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ সন্নিবেশিত হয়। সমীকরণকে সমাধান করার প্রায় ছয়টি নিয়ম তিনি আবিষ্কার করেন। খারিয়মীর গ্রন্থখানি দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে তখন থেকে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে পঠিত হয়। পাটীগণিত বিষয়েও তিনি একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা পরবর্তীতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। বর্তমান যুগ পর্যন্ত গণিত বিদ্যার যে উন্নয়ন এবং এর সহায়তায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে উন্নতি ও আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে তার মূলে আল্-খারিয়মীর উদ্ভাবিত গণিত বিষয়ক নীতিমালারই সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে।

ভূগোল শাস্ত্রে অবদান

ভূগোল শাস্ত্রে মুসলিম ভূগোলবিদদের অবদান যথেষ্ট। তাঁরাই সর্বপ্রথম ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভূতত্ত্ব অনুশীলন এবং একে মর্যাদার আসন দান করেন। তাঁরা একটি ‘সূরত আল্-আর্দ’ বা পৃথিবীর মানচিত্র তৈরী করেন। আল্-খারিয়মী, আল্-মাসউদী, আল্-মুকাদাসী, উমার খাইয়াম ও ইয়াকূত ইব্ন আবদুল্লাহ্ এ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

আল্-খারিয়মী

আল্-খারিয়মী গ্রিক ভূগোলবিদ টলেমির গ্রন্থখানি অনুবাদ করেন এবং তার সঙ্গে একখানা মানচিত্রও সংযোজন করেন। আল্-খারিয়মী টলেমির অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা গ্রহণ করেন, তবে তিনি তার সাথে মুসলিম দেশগুলোর বিবরণ পেশ করেছেন। আল্-খারিয়মীর উদ্যোগে দুনিয়ার একটি বাস্তবরূপ তৈরী করা হয়, যা পরবর্তীকালে পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কনে নমুনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আল্-খারিয়মী পৃথিবীকে সপ্ত ইকলীম বা মডলে ভাগ করেছিলেন। এ সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে ভূগোলবিদগণ আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে পৃথিবীকে সাতটি মহাদেশে বিভক্ত করেন।

আল্-মুকাদাসী

আল্-মুকাদাসী “আহ্‌সান আল্-তাকাসীম ফীল-মারিফাতি আকালীম” নামে একখানি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বিশ বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি সেসব দেশের ভৌগোলিক মূল্যবান তথ্যাদি তুলে ধরেন এবং এতে একটি মানচিত্র সংযোজন করেন।

উমার খাইয়াম

উমার খাইয়াম দীর্ঘদিন গবেষণা করে “আল্ তারিখ জালালী” নামে একটি পঞ্জিকা উদ্ভাবন করেন। এ জন্য তিনি বিশ্ব ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এটি ষোড়শ শতাব্দীতে পোপ গ্রেগরী কর্তৃক প্রবর্তিত পঞ্জিকার চেয়ে বেশি নির্ভুল ও উন্নতমানের।

ইয়াকূত ইব্ন আবদুল্লাহ্

ইয়াকূত ইব্ন আবদুল্লাহ্-আল্-হামাবীর ‘মু’জামুল বুলদান’ নামক গ্রন্থখানি ভূগোল শাস্ত্রের একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এতে তিনি প্রত্যেক স্থানের ঐতিহাসিক, জাতি-তাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের পরিচয় ও ঘটনাসমূহের উল্লেখ করেছেন।

মানবকল্যাণে মুসলমানদের অবদান

ইসলাম মানবকল্যাণের ধর্ম। মানবকল্যাণ সাধনই ইসলামের মূলমন্ত্র। আর্থ, দুস্থের সেবায়, অভাবীর সাহায্যে এবং কল্যাণকর কাজে মুসলমানদের রয়েছে অনুসরণীয় আদর্শ। হযরত উমার (রা) অসংখ্য মসজিদ, হাসপাতাল, সড়ক, সেতু ও বিদ্যালয় নির্মাণ করেন এবং সেচ সুবিধা ও পানীয় জলের জন্য খাল খনন করেন। তাঁর স্ত্রীকে প্রসূতি পরিচর্যার জন্য এক নিঃসজ্জা বেদুঈন মহিলার নিকট প্রেরণ করেন। হযরত উমারের মত আজও যদি আমাদের মধ্যে জনসেবার অনুভূতি জাগ্রত হয় তাহলে গরিব-দুঃখী, অভাবী মানুষের দুঃখকষ্ট অনেকাংশে লাঘব হতে পারে। মদীনায় পানির স্বল্পতার কারণে মুসলমানদের কষ্ট হচ্ছিল। সেখানে ‘রূমা’ নামে একটি কূপ ছিল। সেটিও ছিল এক ইয়াহুদীর মালিকানায়। সে খুব চড়া দামে পানি বিক্রি করত। হযরত উসমান (রা) সে কূপটি পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহামে কিনে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। বাংলায় মুসলিম শিক্ষার গোড়াপত্তনে হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের দান অপরিসীম। মানবকল্যাণে পুরুষের পাশাপাশি মুসলিম নারীগণও বিরাট অবদান রেখে গেছেন। খলিফা হারুন-আর রশীদদের সহধর্মিণী সম্রাজ্ঞী যুবাইদা হাজ্জব্রত পালনে মক্কায় আগত মুসলমানদের কষ্ট দূর করার জন্য একটি খাল খনন করে পবিত্র নগরী মক্কা, মিনা ও আরাফাতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এ খাল ‘নাহর-ই যুবাইদা’ নামে প্রসিদ্ধ।

মামলুক সুলতান মালিক তাহিরের ভগ্নী ৬০৪ হিজরীতে কায়রোতে একটি বিখ্যাত নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। আজুদ-উদ্দৌলার স্ত্রী একটি বিরাট হাসপাতাল তৈরি করেন। মালিক আশরাফের কন্যা খাতুন দামেস্কে একটি বিরাট কলেজ স্থাপন করেন। হেমসের নাসীর উদ্দৌলার স্ত্রী জামরুদ খাতুনও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তৈমুরের সহধর্মিণী খানম নিজ নামে ‘খানম কলেজ’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি নিজে এর ব্যয়ভার বহন করতেন।

বর্তমান যুগে যে সকল মহত্বপ্রাপ্ত নারী মানবকল্যাণে কাজ করে আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করেছেন তাঁদের জন্য এ সকল মুসলিম নারী প্রেরণার উৎস।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

- ১। হযরত মুহাম্মাদ (স) শেষ জামানার নবী হবেন এ ভবিষ্যৎ বাণী কে প্রথম প্রকাশ করেন?
ক. আমিনা খ. আবু তালেব
গ. বহিরা ঘ. আবু জেহেল
- ২। যে পর্বতের গুহায় মহানবী (স)-এর নিকট প্রথম ওহী নাজিল হয় তার নাম -
ক. সাফা খ. মারওয়া
গ. হেরা ঘ. সিনাই।
- ৩। কোন খলিফা গভীর রাতে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন?
ক. হিশাম খ. আবদুল মালিক
গ. মানসুর ঘ. হযরত উমার (রা)
- ৪। হযরত মুহাম্মাদ (স) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ৫৬৯ খ. ৫৭০
গ. ৫৭৩ ঘ. ৫৭৫

নিচের হাদিসের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেন, “আমার এক হাতে সূর্য ও অন্য হাতে চাঁদ এনে দিলেও আমি এ সত্য প্রচার থেকে বিরত হব না।”

- ৫। ইসলামের দাওয়াত বন্ধের লক্ষ্যে কেউ একটা বড় উপহার দিতে চাইলে একজন দাওয়াত প্রদানকারীর কী করা উচিত?
ক. দাওয়াত বন্ধ করে দেবে এবং উপহার গ্রহণ করবে
খ. প্রথমে উপহার নেবে পরে দাওয়াত দিতে থাকবে
গ. উপহার প্রত্যাখ্যান করে দাওয়াত অব্যাহত রাখবে
ঘ. উপহার গ্রহণ করবে না এবং দাওয়াতও অব্যাহত রাখবে না।

- ক. হযরত উমার (রা) কে ছিলেন?
- খ. হযরত উমার (রা)-এর কাবা ঘরে নামায আদায় করার প্রকাশ্য ঘোষণাটি কেমন - ব্যাখ্যা কর।
- গ. হযরত উমার (রা)-এর বাইতুলমালের কাপড়ের ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?
- ঘ. ‘শাসক হিসেবে হযরত উমার (রা)-এর জবাবদিহিতার দৃষ্টান্ত বিরল’- মূল্যায়ন কর।
- ২। শিক্ষক আলমগীর সাহেব তাঁর দশম শ্রেণীর ক্লাসে বলছিলেন, “দেখ, হযরত আবু বকর (রা) নবী মুহাম্মাদ (স) এর ওপর ঈমান আনার পর অসাধারণ হয়ে গেলেন। একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করলেন, “স্যার, কীভাবে? তিনি বললেন - রাসূল (স) কর্তৃক তিনি সিদ্ধিক উপাধি পেয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা) সম্পর্কে মহানবী (স) বলেছেন - “আমি সকলের উপকারের প্রতিদান দিয়ে যেতে পারলাম কিন্তু আবু বকরের প্রতিদান আমি দিয়ে যেতে পারলাম না।” পরবর্তীতে খলিফা হিসাবে হযরত আবু বকর (রা) আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন।
- ক. ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা) কততম ছিলেন?
- খ. হযরত আবু বকর (রা)-কে সিদ্ধিক বলা হয় কেন?
- গ. হযরত আবু বকর (রা) এর জীবন থেকে একজন রাষ্ট্রনায়ক কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. হযরত আবু বকর (রা) এর অবদান মূল্যায়ন কর।
- ৩। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে কিছু দুষ্টু ছেলে রফিকের বোনকে উত্ত্যক্ত করে। রফিক জানতে পারে যে, দুষ্টু ছেলেরা একই বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র। সে প্রধান শিক্ষকের নিকট বিষয়টি জানায় এবং তাঁর সাহায্য চায়। প্রধান শিক্ষক তাকে বলেন, “আইয়্যামে জাহিলিয়াতের সময়ে আরব সমাজে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বিশেষ করে নারী নির্যাতন চরমভাবে দেখা দেয়। এখন আমাদের সমাজে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং শালীনতার অভাবে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে।” রফিক বলল, “স্যার, আমরা এখন কী করব?” তিনি বললেন, “আমাদের রাসূলুল্লাহ (স) এর আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই।”
- ক. ‘আইয়্যামে জাহিলিয়াত’- এর অর্থ কী?
- খ. শালীনতার অভাব বলতে কী বোঝান হয়েছে?
- গ. প্রধান শিক্ষক আর কীভাবে রফিককে সাহায্য করতে পারতেন?
- ঘ. “আমাদের রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই” - বিশ্লেষণ কর।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. নৈতিক চরিত্র গঠনে কুরআনের শিক্ষা- ডঃ আহমেদ শামসুল ইসলাম
২. ইহুইয়াউ উলুম আল-দীন- ইমাম গায্যালী (র)
৩. তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন- মুফতী মুহাম্মদ শফি
৪. সীরাতুননবী- ইব্ন হিশাম, (ইসলামী ফাউন্ডেশন)
৫. মানুষের নবী- মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার ছিদ্বীকী
৬. বিশ্বনবী- গোলাম মোস্তফা
৭. নবীগৃহ সংবাদ- মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ
৮. সাহাবা চরিত- আখতার ফারুক
৯. তায়কিরাতুল আম্বিয়া- কে.এম.জি.রহমান
১০. ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া- আবুল মনসুর আহমদ
১১. বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান- এম.আকবর আলী
১২. মুসলিম মনীষা- আবদুল মওদুদ
১৩. দ্য স্পিরিট অব ইসলাম- সৈয়দ আমীর আলী
১৪. মোস্তফা চরিত- মাওলানা আকরাম খাঁ
১৫. হাদীস সংকলনের ইতিহাস- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম

নির্ঘণ্ট : ১ : আল-কুরআন

- لَوْ كَانَتْ فِيهِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (ع) পৃষ্ঠা ৩
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء : ৪৮) পৃষ্ঠা ৪
 إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ - (النساء : ১৪০) পৃষ্ঠা ৫
 لَا نَقْرَأُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (البقرة : ২৮০) পৃষ্ঠা ৯
 وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنَ الدَّارِ الَّتِي بُنِيَ فِيهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْفَعُونَ ۚ
 أَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (ط) পৃষ্ঠা ১০
 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ۝ ১৪৮
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ১৪৯
 وَمَا تَكُفُّمُ الرَّسُولُ فَحْذَوْهُ (ق) وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا (ع) ১৫০
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (ط) ১৫১
 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ ১৫২
 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ১৫৩
 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۖ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۝ ১৫৪
 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝ ১৫৫
 أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝ ১৫৬
 مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ۝ ১৫৭
 (سُورَةُ الضُّحَى) সূরা আদুহা ১৫৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ১ - وَالضُّحَى .
- ২ - وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى .
- ৩ - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى .
- ৪ - وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى .
- ৫ - وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى .
- ৬ - أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى .
- ৭ - وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى .
- ৮ - وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى .
- ৯ - فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ .
- ১০ - وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ .
- ১১ - وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ .

সূরা আত্‌তীন
পৃষ্ঠা ২৬ (سُورَةُ التِّينِ)

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
- ۱ - وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝
 - ۲ - وَطُورِ سِينِينَ ۝
 - ۳ - وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝
 - ۴ - لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝
 - ۵ - ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝
 - ۶ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝
 - ۷ - فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۝
 - ۸ - أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ ۝

সূরা যিল্‌যাল্
পৃষ্ঠা ৩০ (سُورَةُ الزَّلْزَالِ)

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
- ১ - إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝
 - ২ - وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝
 - ৩ - وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝
 - ৪ - يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝
 - ৫ - بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝
 - ৬ - يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝
 - ৭ - فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝
 - ৮ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

সূরা আন্-ইনশিরাহ্
পৃষ্ঠা ২৪ (سُورَةُ الْاِنْشِرَاحِ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

- ১ - أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝
- ২ - وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝
- ৩ - الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝
- ৪ - وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝
- ৫ - فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝
- ৬ - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝
- ৭ - فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝
- ৮ - وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

সূরা আন্-কাদর
পৃষ্ঠা ২৮ (سُورَةُ الْقَدْرِ)

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
- ১ - إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝
 - ২ - وَمَا أَذْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝
 - ৩ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝
 - ৪ - تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا ۝
 - ৫ - بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ ۝
 - ৬ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ (ق) وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا (ج) ৩২
 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (ع) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ . ৩২
 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ . ৪০
 فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ . ৪০

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا . ৪৩
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (ق) ৪৪
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا (ن) ৪৪
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ৪৪

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ৪৭
 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (ع) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ . ৪৭
 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَذَكَرُوا اللَّهَ
 كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ৪৭

أَقِمِ الصَّلَاةَ ৪৯ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ৪৯
 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ৪৯
 أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ . ৫০

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . ৫০
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . ৫০

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ৫০

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ط بَلْ أَحْيَاءُ (البقرة: ১৫৬) ৫৪

وَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّةً. ۝۵۵ أَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ ۝۵۶
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝۵۷

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَاۥ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝ ٦٠
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۝ ٦١

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. ﴿٦٨﴾

पृष्ठा ७५ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

पृष्ठा ७६ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آوُفُوا بِالْعُقُودِ**

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝

مَا آتَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ○ प्रश्ना ७७

إِعْدِلُوا (قفه) هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (مائدة : ٨) ۞ ۞

فَاحْكُم بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۝

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ . ٥٩

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

क़्ल बِل (सक्ते) रान् عَلَى قُلُوبِهِمْ ० ७४ अथ

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (البقرة) ٩٣

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ - ۞ ۙ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. (توبه : ۱۱۹) ۹۵

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. ۞ ۙ

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ . পৃষ্ঠা ৭৭

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ (الحجرات : ১২) পৃষ্ঠা ৭৮

وَلَا تَجَسَّسُوا . পৃষ্ঠা ৭৮

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (اعراف : ৫২) পৃষ্ঠা ৭৯

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ . পৃষ্ঠা ৮০

الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ পৃষ্ঠা ৮০

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (طه : ৮১) পৃষ্ঠা ৮০

إِنَّ الْمُبْذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ পৃষ্ঠা ৮১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ . পৃষ্ঠা ৮২

নির্ঘণ্ট- ২ : আল-হাদীস

- ১- إِنَّمَا أَلَا عَمَالُ بِالنِّيَّاتِ পৃষ্ঠা ৩৩
 - ২- بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ
 - ৩- خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (ابن ماجه)
 - ৪- آيَةُ الْمَنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ - পৃষ্ঠা ৩৫
 - ৫- مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَاكَلَ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (متفق عليه) পৃষ্ঠা ৩৬
 - ৬- أَلَخَلَقَ عِيَالُ اللَّهِ فَاحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ - পৃষ্ঠা ৩৬
 - ৭- أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ يَكُ ظَالِمًا فَأَرِدْهُ مِنْ ظُلْمِهِ وَإِنْ يَكُ مَظْلُومًا فَانصُرْهُ (دارمی) পৃষ্ঠা ৩৭
 - ৮- الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ পৃষ্ঠা ৩৮
 - ৯- أَلْتَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مستدرك للحاكم) পৃষ্ঠা ৩৮
 - ১০- كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ পৃষ্ঠা ৩৯
- سُبْحَنَ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (بخاری)

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَأَنْبِيَّ بَعْدِي - পৃষ্ঠা ৭

الدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ إِلَّا خِرَّةٌ - পৃষ্ঠা ৯

مَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ - পৃষ্ঠা ১৫

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ - পৃষ্ঠা ২০

أَفْضَلُ عِبَادَةٍ أُمَّتِي قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ০ - পৃষ্ঠা ২০

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوَا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ - পৃষ্ঠা ৩২

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ ০ - পৃষ্ঠা ৫১

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأَمَّهَاتِ - পৃষ্ঠা ৫৫

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَّحِمٍ - পৃষ্ঠা ৫৬

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا - পৃষ্ঠা ৫৮

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ - পৃষ্ঠা ৫৯

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأَمَّهَاتِ - পৃষ্ঠা ৬০

أَلْبِرُّ حُسْنَ الْخُلُقِ - পৃষ্ঠা ৬২

تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنَ الْخُلُقِ - পৃষ্ঠা ৬২

الصِّدْقُ يُنْجِي وَالْكَذِبُ يُهْلِكُ - পৃষ্ঠা ৬৪

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ০ - পৃষ্ঠা ৬৪

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ - পৃষ্ঠা ৬৪

الْخِيَانَةُ تَجْرُّ الْفَقْرَ - পৃষ্ঠা ৬৫

عِدَّةُ الْمُؤْمِنِ دَتْنٌ - পৃষ্ঠা ৬৫

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ - ۹۲



যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার কর
তখন ইনসাফের সাথে বিচার কর
-আল কোরআন

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য